সার্ভিস ব্যাজ
SERVICE BADGE

বাংলাদেশ স্কাউটস
Bangladesh Scouts

সার্ভিস ব্যাজ

(স্কাউট প্রোগ্রাম)

SERVICE BADGE

(Scout Programme)

বাংলাদেশ স্কাউটস

BANGLADESH SCOUTS

সার্ভিস ব্যাজ

স্বত্ব : বাংলাদেশ স্কাউটস

সংকলনে : প্রোগ্রেস ও সার্ভিস ব্যাজ বই টাস্কফোর্স

সম্পাদনা : প্রোগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রকাশনায় : ব্যবস্থাপনা কমিটি, জাতীয় স্কাউট শপ

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন : মাতুরাম চৌধুরী,
সহকারী পরিচালক (আর্ট এন্ড ডিজাইন)

প্রথম প্রকাশ : জুলাই-২০১৫

মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা

মুদ্রণে : মাহির প্রিন্টার্স
২২৪/১ ফকিরেরপুল, ১ম গলি, ঢাকা-১০০০।

সার্ভিস ব্যাজ

স্বত্ব : বাংলাদেশ স্কাউটস

সংকলনে : প্রোগ্রেস ও সার্ভিস ব্যাজ বই টাস্কফোর্স

সম্পাদনা : প্রোগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রকাশনায় : ব্যবস্থাপনা কমিটি, জাতীয় স্কাউট শপ

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন : মাতুরাম চৌধুরী,
সহকারী পরিচালক (আর্ট এন্ড ডিজাইন)

প্রথম প্রকাশ : জুলাই-২০১৫

মূল্য : ২০ (বিশ) টাকা

মুদ্রণে : মাহির প্রিন্টার্স
২২৪/১ ফকিরেরপুল, ১ম গলি, ঢাকা-১০০০।

মুখবন্ধ

স্কাউট প্রোগ্রাম বা কর্মসূচী একটি চলমান বিষয়। যা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বালক-বালিকাদের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। স্কাউটিং যেহেতু জীবনের জন্য শিক্ষা তাই পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী স্কাউট প্রোগ্রাম যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগ মাঠ পর্যায়ে সকল স্তরের রোভার স্কাউট ও অ্যাডাল্ট লিডারের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত প্রস্তাব ও মতামত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করে স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ স্কাউটিংয়ের গোড়াপত্তন হতে স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে। শুরুর দিকে সার্বক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বর্তমান সভাপতি জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এবং বর্তমান জাতীয় কমিশনার (ফাউন্ডেশন) জনাব মু. তৌহিদুল ইসলাম এবং জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন)। তবে সকল সময়েই বাংলাদেশ স্কাউসের প্রোগ্রাম প্রণয়নের প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে তৎকালীন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের বর্তমান সহ-সভাপতি জনাব মো. হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক প্রয়োজনীয় পরামর্শ, দিক নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করে আমাদের অগ্রযাত্রার প্রতিটি পর্যায়কে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই বিভিন্ন পর্যায়ের মতামত ও তথ্য সংগ্রহ করে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে স্কাউটিং কার্যক্রমের প্রথম দশকের প্রারম্ভে প্রকাশিত স্কাউট প্রোগ্রাম প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল।

আনন্দের বিষয় এই যে, প্রথম প্রকাশনার পরবর্তী সময় থেকে স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীরণ এবং যুগোপযোগী করার দীর্ঘ পরিভ্রমণে আরো অনেকে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে প্রোগ্রামকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার জন্য নিজেদের সম্পৃক্ত করে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে-স্কাউট প্রোগ্রাম এবং রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া যার শুরু আছে তবে শেষ নাই।

সমসাময়িক বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্তির ফলে প্রণীত প্রোগ্রামকে যুগোপযোগী, সুপরিকল্পনা প্রসূত নীতিমালা বলে অভিহিত করা যায়। এতে প্রোগ্রেস ব্যাজকে একটি ছকে আবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে সকলে অতি সহজেই স্কাউট প্রোগ্রাম সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। অর্জিত জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে স্কাউটরা আরো অধিক বাস্তব ভিত্তিক স্কাউটিং দক্ষতা অর্জন করবে বলে আমার বিশ্বাস। বর্তমানে সময়ের বালক-বালিকাদের কাছে সার্ভিস ব্যাজের এই বইটি গ্রহণযোগ্য ও আনন্দদায়ক হলেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল ও স্বার্থক বলে মনে করবো। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরো সমৃদ্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ ও বই প্রকাশনায় যারা তাঁদের মূল্যবান সময়, শ্রম, মেধা ও মনন দিয়েছেন বাংলাদেশ স্কাউটস ও আমার পক্ষ থেকে তাঁদের সকলে জানাই স্বশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস

পটভূমি

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল (১৮৫৭-১৯৪১) স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু করার পূর্বেই স্কাউট বয়সী ছেলেমেয়েদের চাহিদা বিবেচনা করে কিছু বই প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এ বইসমূহের সহায়তায় বয়সভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন করে স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন শাখার অর্থাৎ কাব, স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার জন্য পৃথক কার্যক্রম নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে কয়েকটি বই রচনা করেছেন। এই বই সমূহে স্কাউটিং কার্যক্রমে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য প্রচারণামূলক দিকনির্দেশনাসহ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণীয় এবং করণীয় কার্যক্রমের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে স্কাউটিংয়ের দ্রুত প্রসার এবং দীর্ঘস্থায়ীত্বের জন্য এখনও লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের লেখা আকর্ষণীয় বইগুলোর কোনো বিকল্প নেই।

স্কাউট আন্দোলন শুরুর আগে ও পরে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট ও অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য যে সমস্ত বই প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো নিম্নরূপ ঃ-

এইডস টু স্কাউটিং	-১৮৯৯	এ বই পড়েই অনেকে স্কাউটিংয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে
স্কাউটিং ফর বয়েজ	-১৯০৮	স্কাউট শাখার জন্য
উলফ কাব হ্যান্ডবুক	-১৯১৬	কাব শাখার জন্য
এইডস টু স্কাউট মাস্টারশীপ	-১৯২০	অ্যাডাল্ট লিডারদের জন্য
রোভারিং টু সাকসেস	-১৯২২	রোভার স্কাউট শাখার জন্য

দীর্ঘদিন ধরে স্কাউটদের জন্য এ বইগুলো প্রচলিত থাকলেও বিবর্তন এবং যুগ ও দেশের চাহিদার প্রেক্ষিতে স্কাউটিংয়ে নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। আর সেসব নিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ বইপত্রও রচিত হয়েছে এবং এখনও তার অনুসরণ চলছে।

বৃটিশ শাসনামলে ১৯২০ সালে অবিভক্ত ভারতের এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়। তখন স্কাউটিং কার্যক্রমে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত স্তরভিত্তিক বইগুলি ব্যবহার করা হতো। এই স্তরভিত্তিক বইগুলো হচ্ছে-টেন্ডার ফুট, সেকেন্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস। এই স্তরভিত্তিক বইসমূহে বিভিন্ন পারদর্শিতা ব্যাজের করণীয় উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে প্রতিটি ব্যাজের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পৃথক পৃথক বই রচনা করা হয়।

বৃটিশ শাসনামলের অবসানের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান জন্মের সুচনা থেকে এই অঞ্চলে স্কাউট আন্দোলন নতুন ভাবে সংগঠিত হয়। সেই সময়ের প্রথম পর্যায়ে বৃটিশ আমলে ইংরেজিতে প্রকাশিত স্তরভিত্তিক বইগুলি ব্যবহৃত হলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্কাউটিংয়ের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজিতে লেখা বইগুলি বাংলায় অনুবাদ করা হয়।

এই প্রক্রিয়ায় টেন্ডার ফুট বইটিকে কচি কদম, সেকেন্ড ক্লাস বইটিকে দ্বিতীয় কদম এবং ফার্স্ট ক্লাস বইটিকে দৃপ্ত কদম নামে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়। এই অনুবাদের ধারাবাহিকতায় স্কাউটার মরহুম এম ওয়াজেদ আলী ব্যাডেন পাওয়েল এর লেখা 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' বইটি বালকদের স্কাউট শিক্ষা নামে ১৯৫৭ সালে বাংলায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে

বই অনুবাদ কার্যক্রম একটি চলমান কর্মসূচিতে রূপ লাভ করে। অনুবাদের চলমান কর্মসুচির অংশ হিসেবে তরিকুল আলম ও জহুরুল আলম ১৯৫৯ সালে কাব স্কাউট হ্যান্ডবুক বইটিকে কাব স্কাউট শিক্ষা নামে বাংলায় অনুবাদ করেন। স্কাউট শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য গৃহিত এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্কাউটিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন বিষয়ের বইগুলিকে বাংলায় রূপান্তর করা হয়।

স্বাধীনতা অর্জনের পর মুহূর্ত থেকে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রম সংগঠিত হতে থাকে এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলন পূনর্গঠিত হলে স্কাউটিংয়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্কাউটিং সম্পর্কিত পাঠ্য বইয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুনভাবে শুরু করা রোভারিং কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৭৩ সালে স্কাউটার আ স মু মাকসুদুর রহমান রোভার পরিকল্পনা নামে বইটির পান্ডুলিপি রচনা করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে এদেশে স্কাউটিং কার্যক্রমের নীতি, পদ্ধতি ও পরিচালনার জন্য পি.ও.আর (নীতি, সংগঠন ও নিয়ম) নামের বইটি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে কয়েক বছর ব্যবহৃত হওয়ার পর ১৯৭৫ সালে "বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি" নামে প্রথমবারের মতো গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯৮৪ সালে "গঠন ও নিয়ম" নামে নতুন ভাবে নীতি পদ্ধতির বইটি প্রকাশ করা হয়। স্বাধীন দেশে স্কাউটিং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচলিত স্তরভিত্তিক বইসমূহের তথ্য এবং বাস্তব চাহিদা নিরূপন করে ১৯৭৮-৭৯ সালে তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মরহুম নূরুলিসলাম শামসের উদ্যোগে নতুন স্কাউট প্রোগ্রাম নির্ধারন করে ঐ প্রোগ্রামের আলোকে বয় স্কাউট শাখার বই লেখা হয়। প্রোগ্রাম অনুসারে বইগুলির পান্ডুলিপি প্রণয়ন করেন তৎকালীন রোভার স্কাউট এবং বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তৎসময়ে রোভার স্কাউট এবং বর্তমানে জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) মুঃ তৌহিদুল ইসলাম ও তৎকালীন রোভার স্কাউট মোজাহারুল হক মঞ্জু। এসব পান্ডুলিপির ভিত্তিতে নিম্নের শাখাভিত্তিক বইসমূহ প্রকাশিত হয়।

সদস্য ও স্ট্যান্ডার্ড	১৯৭৯
প্রোগ্রেস	১৯৮০
সার্ভিস	১৯৮১

এই স্তর ভিত্তিক বইসমূহে স্কাউটদের জন্য পালনীয় পারদর্শিতা ব্যাজের প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে স্কাউটেরা স্ব স্ব স্তরের প্রোগ্রাম অনুসরণ করে ব্যাজ অর্জন করতে সক্ষম হয়। পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালে বয় স্কাউট শাখার স্তরভিত্তিক বইসমূহকে একত্রিত করে বয় স্কাউট নামে এটি অখন্ড বই প্রকাশ করা হয়। এই অখন্ড বইটির মধ্য দিয়ে স্কাউটদের নিকট ক্রমোন্নতিশীল স্কাউট প্রোগ্রাম অনুসরণ অধিকতর সহজ করা হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে স্কাউট শাখার প্রোগ্রামে আবার পরিবর্তন আনা হয় এবং পারদর্শিতা ব্যাজের কর্মসূচিকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এই পর্যায়ে স্কাউট প্রোগ্রামকে আরও বেশী কার্যকরী করার জন্য স্তরভিত্তিক আলাদা আলাদাভাবে বই প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক সময়ের অত্যন্ত দক্ষ স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ স্ব স্ব অবস্থানে থেকে বই সমূহ প্রকাশে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন, তার বিবরণ নিম্নরূপঃ

সদস্য ব্যাজ	আরিফ বিল্লাহ আল মামুন	১৯৯৭
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ	মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান	১৯৯৫
প্রোগ্রেস	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	১৯৯৬
সার্ভিস ব্যাজ	মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া	১৯৯৬

স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের পাশাপাশি ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিক থেকে কাবস স্কাউট ও রোভার স্কাউটসের প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। কাব স্কাউট ও রোভার স্কাউট শাখার স্তরভিত্তিক বইসমূহের পান্ডুলিপি প্রনেতা ও প্রকাশ সময় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সদস্য ব্যাজ	মোঃ আব্দুল ওয়াহাব	১৯৯৫
তারা ব্যাজ	মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	১৯৯৬
চাঁদ ব্যাজ	রওশন আরা বিউটি	১৯৯৭
চাঁদতারা ব্যাজ	মোছাম্মৎ জোহরা আক্তার	১৯৯৭
রোভার সহচর	মোফাখখার হোসেন	১৯৯৭
সদস্য স্তর	মোফাখখার হোসেন	১৯৯২
প্রশিক্ষণ স্তর	মোঃ আরিফুজ্জামান	১৯৯৫
সেবাস্তর	আদিল হায়দার সেলিম	১৯৯৬

এছাড়া রোভার স্কাউটদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল রচিত রোভারিং টু সাকসেস বইটি প্রবীণ লিডার ট্রেনার এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) প্রফেসর মাহাবুবুল আলম বাংলায় অনুবাদ করেন। স্কাউট আন্দোলনের পরিবর্তনের এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক চলমান প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চাহিদা অনুভূত হওয়ায় স্কাউট ও রোভার শাখায় ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে আরও বেশী আধুনিকীকরণ করার জন্য ২০০০ সালে তৎকালীন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীকের নেতৃত্বে পূনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সময় স্কাউট প্রোগ্রাম ও রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য জুবায়ের ইউসুফের তত্ত্বাবধানে স্কাউট প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স এবং মোঃ আরিফুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্স নামে দুটি পৃথক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স দু'টির মাধ্যমে উভয় শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামকে যুগোপযোগী করার জন্য যাত্রা শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে তৎসময়ের জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) মুঃ তৌহিদুল ইসলাম, মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া ও কাজী নাজমুল হক নাজু প্রোগ্রাম নবায়নে টাস্কফোর্সে দু'টিকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন। এই প্রক্রিয়ায় রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণে রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব হিসেবে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট মোঃ জামাল হোসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই টাস্কফোর্স দু'টি প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের জন্য ২০০১ সাল থেকে শুরু করে ২০০৩ সাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ার্কশপ, সেমিনার, আলোচনা পর্যালোচনাসহ জাতীয় ও অঞ্চল পর্যায়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শাখা ভিত্তিক প্রোগ্রাম নবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রচলিত প্রোগ্রামে সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন,পরিবর্তন ও পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করে স্কাউট প্রোগ্রাম এবং রোভার প্রোগ্রামকে যুগের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদার

ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে পূর্ণতা দেয়া হয়। এই কাঠামোগত পূর্ণতা তৈরির পর উভয় শাখায় অন্তর্ভুক্ত নতুন নতুন বিষয়বস্তু ও ব্যাজের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এই কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কাব স্কাউট ও স্কাউট শাখায় প্রচলিত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত বই সমূহকে আরও বেশী আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক পরিমার্জিত আকারে প্রস্তুতকৃত বইসমূহ প্রকাশনায় তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মুহঃ ফজলুর রহমান সার্বিক সহায়তা দান করেন এবং বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ বইগুলি সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন।

২০০৪ সালে প্রচলিত বইসমূহ পরিমার্জিত আকারে প্রকাশের কিছুদিন পরেই ২০০৩ সালে প্রণয়নকৃত স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রামের কাঠামো দু'টিকে পুনরায় যাচাই বাছাই করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই যাচাই বাছাইয়ের জন্য ২০০৪-২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ ফোরাম এবং জাতীয় ওয়ার্কশপসহ আয়োজিত আলোচনাসমূহ বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ও তৎসময়ের জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাঁকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেন তৎসময়ের প্রোগ্রাম বিভাগে দায়িত্ব পালনকারী জাতীয় উপ কমিশনার সরোয়ার মোঃ শাহরিয়ার, মোঃ মাহমুদুল হক এবং মোঃ মনিরুল ইসলাম খান। এই পর্যায়ে প্রাপ্ত প্রস্তাবনা সমূহ সমন্বিত করে ২০০৯ সালে স্কাউট ও রোভার শাখার প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই উদ্যোগকে কার্যকরী করার লক্ষ্য নিয়ে স্কাউট ও রোভার শাখায় প্রোগ্রাম বই প্রকাশের উদ্দেশ্যে জুবায়ের ইউসুফ ও মোঃ আরিফুজ্জামানকে পৃথকভাবে পুনরায় আহবায়কের দায়িত্ব দিয়ে প্রোগ্রাম বই প্রকাশের জন্য দু'টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স দু'টিতে সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে স্কাউটার মোঃ মাইনুল হক ও স্কাউটার খন্দকার সাদিদ সাঈদ। টাস্কফোর্সের একাধিক পর্যালোচনা বৈঠক ও জাতীয় সদর দফতর এবং জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চূড়ান্ত পর্যালোচনা ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণের কাজটি সম্পন্ন হয়। প্রায় ২৫ বছরের ব্যবহৃত স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম নবায়নের জন্য ২০০৩ সাল থেকে শুরু ২০০৯ সাল পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯ সালের প্রথম দিকে জাতীয় প্রোগ্রাম কমিটির তৎকালীন সভাপতি মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর এই গৃহীত পদক্ষেপের ফলে জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া এর উপস্থাপনায় ০৯ আগস্ট ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কাউন্সিলের ৩৮তম বার্ষিক অধিবেশনে উভয় শাখার প্রোগ্রাম অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে এই বইগুলোর পান্ডুলিপি তৈরির জন্য আলাদা আলাদা টাস্কফোর্সকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। স্কাউট প্রোগ্রেস ব্যাজ বই প্রকাশনার জন্য বই পান্ডুলিপি সংকলন করেন টাস্কফোর্স সদস্য **রোভার স্কাউট সৈয়দ মোঃ সিয়াম, রোভার স্কাউট মোঃ সাইফুল ইসলাম আকাশ ও রোভার স্কাউট মোঃ লিয়াকত হোসেন**। নবায়নকৃত স্কাউট ও রোভার প্রোগ্রাম জাতীয় কাউন্সিলে অনুমোদনসহ প্রণয়নকৃত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত এই বই প্রকাশে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে প্রধান জাতীয় কমিশনার মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রোগ্রাম সংক্রান্ত কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধিকে আরও বেশী জোরদার করেছেন।

সূচিপত্র

	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
স্কাউট আদর্শ	সাংগঠনিক জ্ঞানঃ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জানা।	০৯
	বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিক অংকন ও ব্যাখ্যা করতে পারা।	১০
	ধর্ম পালন	১১
স্কাউট দক্ষতা	দড়ির কাজ	২১
	কোড ও সাইফার	২৩
	স্কাউট পতাকা	২৬
	অনুমান	২৮
	সংকেত	২৯
	উপস্থিত বক্তৃতা	৩১
জীবন শিক্ষা ও সমাজ সেবা	স্কাউট সেবা	৩২
	বিভিন্ন মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ ও সচেতনতা	৪৭
	সঞ্চয়	৪৯
স্বদেশ সংস্কৃতি ও পরিবেশ	পরিবেশ ঃ একটি রিং ও একটি স্ল্যাবের মাধ্যমে সেনেটারী ল্যাট্রিন তৈরি	৫০
	সরকারের গঠন ও কার্যাবলী	৫১
	শব্দ দূষণ	৫২
প্রযুক্তি শেখা ঃ	ধোঁয়াবিহীন উন্নত চুলা তৈরি	৫৪
	কম্পিউটারের সাধারণ বাহ্যিক হার্ডওয়্যার সম্পর্কে জানা	৫৪
গান জানা	স্কাউট সিডির পরের দুইটি গান	-
ট্রুপ মিটিং	কমপক্ষে ১২-১৫টি ট্রুপ মিটিং-এ অংশগ্রহণ করা	-

❒ স্কাউট আদর্শ

(১) সাংগঠনিক জ্ঞান ঃ

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের গঠন ও কার্যাবলী

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ স্তরে ইতোপূর্বে তোমরা স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস, প্রোগ্রেস স্তরে বাংলাদেশ স্কাউটসের ইতিহাস সম্পর্কে জেনেছ। এই স্তরে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল সম্পর্কে জানবে। নিম্নে তা আলোচনা করা হল ঃ

বিশ্ব স্কাউট সংস্থার পক্ষে এককভাবে বিশ্বের সকল দেশের স্কাউট সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা কঠিন, তাই কাজের সুবিধার জন্য বিশ্ব স্কাউট সংস্থা সারা পৃথিবীকে ছয়টি রিজিওন বা অঞ্চলে ভাগ করেছে। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল এই ছয়টির একটি। ১৯৫৬ সালে বিশ্ব স্কাউট কমিটি দূর-প্রাচ্য (Far-East) অঞ্চল গঠন করে। সে সময় এই অঞ্চলের সাথে ১০টি জাতীয় স্কাউট সংগঠন তালিকাভূক্ত ছিলো। ১৯৫৮ সালে অর্থাৎ ২ বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে দূর প্রাচ্য স্কাউট কাউন্সিল গঠিত হয়। ১৯৭০ সালে দূর-প্রাচ্য অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল রাখা হয়। বর্তমানে এই অঞ্চলের সদর দফতর ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অবস্থিত।

মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশসমূহ ছাড়া দক্ষিণ, পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় স্কাউট সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে এ অঞ্চল গঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই অঞ্চলের সদস্য দেশের সংখ্যা ২৪টি।

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সদস্য দেশগুলি হচ্ছে-অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ভুটান, ব্রুনাই, হংকং, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিজি, জাপান, নিউজিল্যান্ড, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, সিংগাপুর, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ, কিরিবাতি, মংগোলিয়া, ম্যাকাও এবং পলিনেশিয়া (সহযোগী সদস্য)। এ ছাড়া সহযোগিতা করছে আরও ৯টি সদস্য দেশ যেমন ঃ আফগানিস্তান, কম্বোডিয়া, পূর্ব তিমুর, নাউরু, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, টোংগা, টুভালু, ভানুয়াতু ও পশ্চিম সামোয়া।

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছে এশিয়া প্যাসিফিক স্কাউট কনফারেন্স, এশিয়া-প্যাসিফিক স্কাউট কমিটি। এছাড়া, সেই কমিটিকে সহযোগিতার জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটি উপ-কমিটি।

এশিয়া-প্যাসিফিক স্কাউট কনফারেন্স

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সদস্য দেশগুলির প্রত্যেক দেশ থেকে ৬জন করে

প্রতিনিধি নিয়ে এশিয়া-প্যাসিফিক স্কাউট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্স কোন সদস্য দেশ থেকে কমপক্ষে একজন প্রতিনিধি অংশ নিলেও দেশটি ৬টি ভোটের অধিকারী হবে, কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকলে দেশটি ভোট দিতে পারবে না।

এশিয়া-প্যাসিফিক স্কাউট কমিটি

এশিয়া-প্যাসিফিক স্কাউট কনফারেন্স এর সদস্য কর্তৃক ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত ১০ জন সদস্য নিয়ে এশিয়া-প্যাসিফিক কমিটি গঠিত হয়। ৩ বছর অন্তর প্রতি কনফারেন্স ৫ জন সদস্য মেয়াদান্তে অবসর নেন এবং নতুন ৫ জন সদস্য নির্বাচিত হন। মেয়াদ শেষে কেউই পুনঃ নির্বাচিত হতে পারে না। তাকে কমপক্ষে ৬ বছর অপেক্ষা করতে হবে, অর্থাৎ একই সাথে ৬ বছরের বেশী সদস্য থাকা সম্ভব নয়। এই কমিটি এশিয়া-প্যাসিফিক কনফারেন্সের পক্ষে নির্বাহী দায়িত্ব পালন করে। কাজের সুবিধার জন্য এই কমিটির একাধিক উপ-কমিটি আছে। উপ-কমিটিসমূহ ঃ

১। প্রোগ্রাম সাব-কমিটি
২। এডাল্ট রিসোর্স সাব কমিটি
৩। ব্যবস্থাপনা সাব কমিটি
৪। ফাইন্যানসিয়াল রিসোর্স সাব কমিটি
৫। স্কাউটিং প্রোফাইল সাব কমিটি

৫টি সাব কমিটি ছাড়াও এপিআর টাস্কফোর্স ফর ২০০৬-২০০৭ এবং এপিআর ফাউন্ডেশন ম্যানেজমেন্ট সাব কমিটি রয়েছে।

(২) বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের অংকন ও ব্যাখ্যা

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের রূপকার কামরুল হাসান। জাতীয় প্রতীক ব্যবহারের উপযোগী মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় প্রতীক সম্পর্কে সংবিধানের ৪ (৩) অনুচ্ছেদে বর্ণনা আছে।

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক হচ্ছে উভয় পার্শ্বে ধানের শীষ বেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় ফুল শাপলা, এর শীর্ষে পাট গাছের পরস্পর সংযুক্ত তিনটি পাতা এবং তার উভয় পার্শ্বে দুটি করে মোট চারটি তারকা। ফুল পবিত্রতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রতীক। এছাড়া শাপলা ফুল আমাদের দেশে সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং আমাদের জাতীয় ফুল।

খাদ্য শষ্যের মধ্যে ধান আমাদের প্রধান ফসল এবং সর্বত্র দৃশ্যমান। পাট আমাদের প্রধান অর্থকারী ফসল যা সোনালী আঁশ নামে খ্যাত। আমাদের দেশ নদীমাতৃক দেশ। সর্বত্রই জালের মত নদ-নদী ছড়িয়ে আছে।

আমাদের দেশের প্রণীত সংবিধান চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত যা চারটি তারার মাধ্যমে প্রকাশিত। এই সব কিছুরই উপর ভিত্তি করে আমাদের জাতীয় প্রতীকের উদ্ভব হয়েছে।

(৩) ধর্ম পালন

ধর্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসমূহ। কোরআন, হাদীস, বেদ, পুরান, বাইবেল, ত্রিপিটক বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় পুস্তক। এ গ্রন্থগুলোতে একদিকে যেমন ধর্মীয় বিধি বিধান রয়েছে, পাশাপাশি এগুলো আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে। ইসলামী আইনসমূহ মূলতঃ কোরআন ও হাদীসে বর্ণনা করা আছে। অনেক বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদগণ কোরআন ও হাদীসের আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

সেগুলোকে বলা হয় "ইজমা"। আবার কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার আলোকে বর্তমান অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে ইসলামী চিন্তাবিদগন কোন বিষয়ে একমত হওয়াকে বলে "কিয়াস"। কাজেই ইসলামী আইনের মূল উৎস হচ্ছে কোরআন, হাদীস বা সুন্না, ইজমা এবং কিয়াস। একইভাবে হিন্দু আইনের মূল উৎস হচ্ছে বেদ, পুরান, নিবন্ধ ও ব্যাখ্যা। সম্পদ বন্টন, সম্পদের ব্যবস্থাপনা, ওয়াকফ, দেবোত্তর, দান, উইল, অভিভাবকত্ব, বিবাহ, দত্তক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীগণের ধর্মীয় বিধি বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। দেশের প্রচলিত আইন এ সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় আইনের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

ইসলাম ধর্ম ঃ

ইতোপূর্বে তোমরা সদস্য স্তরে কালেমা, নামাজ, রোজা, শবেকদর, জুমাতুল বিদা, ঈদুল ফিতর, হজ্জ, ঈদুল আজহা, যাকাত, শবে মেরাজ, শবে বরাত, ফাতেহা দোয়াজ দহম, ফাতেমা ইয়াজ দহম, আশুরা, স্ট্যান্ডার্ড স্তরে রোজা তিন প্রকার, রোজার নিয়তের বিবরণ, রমজান মাসে রোজার নিয়ত, ইফতারের

বিবরন, ইফতারের নিয়ত, প্রোগ্রেস স্তরে হজ্জ, কুরবানী ও যাকাত সম্পর্কে শিখেছ এবং ব্যক্তি জীবনে তা চর্চা করে যাচ্ছ। সার্ভিস ব্যাজের জন্য নিম্ন বর্ণিত ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে তা অন্যদেরকে শিক্ষাদান করতে হবে।

আকিকা ঃ মুসলমানদের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সন্তানদের মঙ্গল কামনা করে ছাগল বা গরু জবাই করে তার গোস্ত/ মাংস চার ভাগ করে একভাগ দুঃস্থদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াকেই আকিকা বলে। আকিকা করা সুন্নত।

সন্তান জন্মাবার পর ৭, ১৪ বা ২১তম দিন অথবা সুবিধামত সময়ে তার একটি সুন্দর নাম রেখে আকিকা করা ভাল। ছেলেদের জন্য ২টি এবং মেয়েদের জন্য একটি ছাগল বা ভেড়া জবাই করতে হয়। তবে গরু বা মহিষ হলে প্রত্যেক ছেলে সন্তান এর জন্য ২ ভাগ এবং মেয়ে সন্তানের জন্য ১ ভাগ হিসাবে মোট সাত ভাগ করা যায়।

কোরবানীর পশুর মত আকিকার পশুও নিখুঁত হতে হবে এবং কমপক্ষে এক বছর বয়সের ছাগল বা ভেড়া অথবা দুই বছর বয়সের গরু বা মহিষ হওয়া দরকার। কোরবানীর পশুর মধ্যেও আকিকার জন্য ভাগ রাখা যায়।

আর্থিকভাবে কম সামর্থবান লোকদের ছেলে সন্তানদের জন্য ১টি ছাগল বা ১টি ভেড়া অথবা গরু/মহিষের ক্ষেত্রে ১ ভাগ হলেও চলবে। তবে অসামর্থবান লোকদের জন্য আকিকার প্রয়োজন নেই।

জানাজার নামাজ ঃ

মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাত কামনায় মুর্দাকে দাফন করার আগে যে নামাজ পড়া হয়, তাকে জানাজা বলে। জানাজার নামাজ পড়া ফরজে কেফায়া অর্থাৎ সবার পক্ষ থেকে কতক মুসলমান আদায় করলেই সবাই দায়মুক্ত হবে। কেউ আদায় না করলে সবাই দোষী হবে।

জানাজার নামাজে দু'টি কাজ অব্যশই করণীয় অর্থাৎ ফরজ (১) চারবার তাকবির দেয়া বা আল্লাহু আকবার বলা (২) দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া। এই নামাজে রুকু, সেজদা এবং বৈঠক নেই। নামাজ পড়ার নিয়ম হচ্ছে, প্রথম নিয়ত করে তাকবির বলে হাত বাঁধতে হবে এবং তারপর ছানা পড়তে হবে। এরপর ২য় তাকবির দিয়ে দরুদ পড়তে হবে, ৩য় তাকবির বলে আত্মার মাগফেরাত কামনার্থে দোয়া পড়তে হবে এবং ৪র্থ তাকবির বলে সালাম ফেরাতে হবে। ২য়, ৩য় বা ৪র্থ তাকবিরে নতুন করে হাত বাঁধতে হয় না। এভাবে জানাজার নামাজ শেষ হয়।

মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ তাদের ধর্মের এই ধরণের প্রয়োজনীয় বিষয়

সমূহে জ্ঞান অর্জন করে ছোটদের মধ্যে শিক্ষাদান করবে।

কাফন ঃ

মুর্দাকে গোসল করিয়ে দাফন করার উদ্দেশ্যে যে পবিত্র কাপড়ে আবৃত করে দাফন করা হয় তাই হচ্ছে কাফন। মুর্দাকে উত্তর দিকে মাথা এবং দক্ষিণ দিকে পা রেখে শোয়ানো হয় এবং পরে মুর্দাকে দাফন করা হয়।

মুর্দা পুরুষ হলে তিন প্রস্থ কাপড় লাগবে ঃ

১) লেফালা ঃ মাথা থেকে পা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের চেয়ে এক হাত বড়

২) ইজার ঃ মাথা থেকে পা পর্যন্ত

৩) পিরহান ঃ ঘাড় থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত

মুর্দা স্ত্রীলোক হলে পাঁচ প্রস্থ কাপড় লাগবে ঃ

১) লেফালা ঃ মাথা থেকে পা পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের চেয়ে একহাত বড়

২) ইজার ঃ মাথা থেকে পা পর্যন্ত

৩) পিরহান ঃ ঘাড় থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত

৪) ছিনাবন্ধ ঃ বগল থেকে হাঁটু পর্যন্ত

৫) দামনী ঃ মাথার চুল বাঁধার জন্য

তবে অসমর্থ হলে পুরুষের তিন বা স্ত্রী লোকের পাঁচ প্রস্থ কাপড়ের কমেও দেয়া যেতে পারে।

হিন্দু ধর্ম ঃ

সদস্য স্তরে ইতোপূর্বে তোমরা ধর্মতত্ত্ব, বিশ্বাস, আচার, অনুষ্ঠান, ঈশ্বরবাদ, আত্মা, ঈশ্বর, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ স্তরে নিত্যকর্ম, অবতারবাদ, ঈশ্বর অবতারের পার্থক্য, কয়েকজন অবতারের কথা, কর্মবাদ, নিষ্কাম কর্ম, প্রোগ্রেস ব্যাজ স্তরে পূজার্চনা, পূজার বিধি, পূজার উপাচার, নারায়ণ পূজা, গনেশ পূজা, লক্ষ্মী পূজা, স্বরস্বতী পূজা সম্পর্কে শিখেছ এবং ব্যক্তি জীবনে তা চর্চা করে যাচ্ছ। এই স্তরে নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে শিখবে ও অনুশীলন করবে।

কর্মযোগ ঃ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এ তিনটি ধর্ম সাধনের সাধারণ অঙ্গ। এ তিনটিতে সিদ্ধ হলে ধর্ম লাভ পূর্ণাঙ্গ হয়। তাই এদের প্রত্যেকটিকে বলে যোগ, মানে সাধনার উপায়। কর্মযোগ হলো সাধনার একটি উপায়। কর্ম মানে স্বকর্ম। যার যে কাজ তা-ই তার স্বকর্ম। কবি বলেছেন- "কর কর্ম হবে জয়"। তুমি একমনে তোমার কর্তব্য করে যাও, তবেই সাফল্য লাভ করবে। এ কর্তব্যকর্মই হচ্ছে স্বকর্ম। স্বকর্ম হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। কাজ করার আগেই মনে রাখবে কাজটি ঈশ্বরের কাজ। ঈশ্বর তোমাকে দিয়ে করাচ্ছেন, তুমি করে যাচ্ছ। ফলাফলের দায়িত্ব তোমার নেই।

জ্ঞানযোগ ঃ জ্ঞানযোগ সাধনার দ্বিতীয় মার্গ বা স্তর। লোকের হিত এবং ঈশ্বরের প্রীতির জন্য যা কর্তব্য তা-ই হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞানজনিত কর্মই হল জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগে কর্তার হৃদয়ে ঈশ্বর ভাব জেগে ওঠে। কর্তা ক্রমশ প্রত্যেকের মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, তা মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে পারেন। অতএব স্বধর্ম বা নিজ কর্তব্য পালনকর্তার নিজের হিতের জন্য, অন্যের হিতের জন্য। জ্ঞানী নিজেকে অকর্তা জেনে পরব্রহ্মকে জেনে মুক্তিলাভ করেন।

ভক্তিযোগ ঃ সাধনার তৃতীয়পথ ভক্তিমাগ। কর্মমার্গের ফল-নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন। জ্ঞানমার্গের ফল-জনকল্যাণ ও ঈশ্বরের প্রীতির জন্য নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন। আর যিনি ঈশ্বরে চিত্ত স্থির করে লোকহিতার্থ ও লোকশিক্ষার জন্য সর্বদা অভ্যস্ত নিষ্কাম কর্ম করতে থাকেন, তিনিই ভক্তির সাধনা করেন। যিনি ভক্তি সাধনা করেন তিনিই ভক্ত। জ্ঞানী কর্ম করেন লোকহিতার্ত ও ঈশ্বরের প্রীতির জন্য। কিন্তু ভক্তিমার্গের

অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। ভক্ত সর্বজীবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন, কেবল ঈশ্বরের হিতার্থ কাজ করেন। এ পর্যন্ত তিনি লোকহিতার্থ যে কাজ করে আসছেন আজ তা ঈশ্বরের কাজ। ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রীতির জন্য এখন ভক্তের এই কর্তব্য।

দশবিধ সংস্কার ঃ

সমগ্র জীবনে যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয় সেগুলোকে বলা হয় সংস্কার। স্মৃতি শাস্ত্রে সংস্কারের উল্লেখ আছে। নিম্নে দশবিধ সংস্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হল ঃ-

১। **গর্ভাধান ঃ** গর্ভসঞ্চারের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে বলা হয় গর্ভাধান।

২। **পুংসবন ঃ** পুত্র সন্তান কামনা করে যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়, তাকে পুংসবন বলা হয়।

৩। **সীমন্তোন্নয়ন ঃ** গর্ভধারনের পর ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমান্তোন্নয়ন করা হয়।

৪। **জাতকর্ম ঃ** জন্মের পর পিতা যব, যষ্টিমধু ও ঘৃতদ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচারন করেন জাতকর্ম সংস্কারে।

৫। **নামকরণ ঃ** সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশতম দিবসে নামকরন করণীয়।

৬। **অন্নপ্রাশন ঃ** পুত্রের ষষ্ঠ মাসে এবং কন্যার পঞ্চম, অষ্টম বা দশম মাসে পূজাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্নভোজনের নাম অন্নপ্রাসন।

৭। **চূড়াকরন ঃ** গর্ভাবস্থায় সন্তানের মস্তকে যে কেশ উৎপন্ন হয় তা মুন্ডনের নাম চূড়াকরণ।

৮। **উপনয়ন ঃ** উপনয়ন শব্দের অর্থ নিকটে নিয়ে যাওয়া। যে অনুষ্ঠানের পর ছাত্রকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য গুরুর নিকট নিয়ে যাওয়া হত তার নাম ছিল উপনয়ন। উপনয়ন শব্দের সহজ অর্থ যজ্ঞোপবীত বা পৈতা ধারণ।

৯। **সমাবর্তন ঃ** প্রাচীনকালে পাঠ শেষে গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হতো তার নাম ছিল সমাবর্তন। এই অনুষ্ঠানে গুরু শিষ্যকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন।

১০। **বিবাহ ঃ** যৌবনে দেব, পিতৃপূজা ও হোম প্রভৃতির মাধ্যমে মন্ত্রোচারণপূর্বক বর ও বধূর মিলনস্বরূপ সংস্কারকে বলা হয় বিবাহ।

এই দশটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের নাম দশকর্ম। বিবাহ খুব বড় উৎসব। এ আমরা সকলেই বুঝি। গর্ভাধান এখন আর অনুষ্ঠিত হয় না। পুংসবন গর্ভের তৃতীয় মাসে গর্ভশোধনের জন্য করা হত। এখন পুংসবনও লোপ পেয়ে যাচ্ছে। জাতকর্ম সন্তান জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হত। এখন ষষ্ঠী পূজা প্রভৃতি কিছু কিছু অনুষ্ঠান করা হয়। নামকরন ও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়। চূড়াকরন ও উপনয়ন এ দুটো সংস্কার বর্তমানে ব্রাহ্মণ ছেলেদের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে বিভিন্ন সময়ে সংস্কার দুটো অনুষ্ঠিত হত। এখন একদিনেই চূড়াকরন ও উপনয়ন অনুষ্ঠিত হয়। চূড়াকরনের প্রথমে কান ফোঁড়ানো পরে অন্যান্য অনুষ্ঠান হত। উপনয়নে পৈতা দেয়া হয়। গুরুগৃহে পাঠ শেষ করে গৃহে ফিরে আসার নাম সমাবর্তন।

খ্রিষ্ট ধর্ম ঃ

ইতোপূর্বে সদস্য স্তরে তোমরা খ্রিষ্ট ধর্ম, খ্রিষ্টের অনুসারী হওয়ার গুনাবলী, প্রার্থনা ও উপবাসের প্রয়োজনীয়তা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের ভালবাসার উপলব্ধি, জীবন সাক্ষ্য, ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ বইয়ে বাইবেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পবিত্র বাইবেল পাঠের উদ্দেশ্য, মন্ডলীর শিক্ষা, প্রোগ্রেস স্তরে মুক্তির ইতিহাস, ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও পরিকল্পনা, ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পবিত্র আত্মার উপস্থিতি, মন্ডলীর পার্বনসমূহ সম্পর্কে শিখেছ। এই স্তরে নিম্নের বিষয়গুলি সম্পর্কে জানবে ও অনুশীলন করবে।

খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের করনীয় ঃ

(১) নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

(২) প্রকৃত সেবক (মার্ক ৯ঃ ৩৩ -৩৭)

(৩) ভালবাসা (মার্ক ১২ঃ২৮-৩৩/১ করিঃ ১৩ঃ১-১৩)

(১) নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ জন্মসূত্রে প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে ও জাতীয় জীবনে নিরাপত্তা ও অধিকার ভোগের দাবীদার। পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য তাকেও রাষ্ট্রের ও জাতির প্রতি আনুগত্য স্বীকারসহ যথাযথ শ্রদ্ধাবোধ পোষন করা তার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। পবিত্র বাইবেলে এ সম্বন্ধে অনেক ঘটনার বর্ণনা দেওয়া আছে।

(২) প্রকৃত সেবক ঃ এবার তাঁরা কাফার্নাউমে এসে পৌছালেন। বাড়ীতে আসার পর যিশু শিষ্যদের এই প্রশ্ন করলেন ঃ "পথে কী নিয়ে তোমাদের মধ্যে এত তর্ক হচ্ছিল? "তাঁরা চুপ করে রইলেন, কারণ পথে তাঁরা নিজেদের মধ্যে এই নিয়েই তর্ক করছিলেন যে, তাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড়। যিশু তখন সেখানে বসে বারোজনকে কাছে ডেকে বললেনঃ "কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তাহলে সে যেন সকলের শেষেই থাকে, সে যেন সকলেরই সেবক হয়!" তারপর তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাদের সামনে দাঁড় করালেন; আর দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ "যে-কেউ আমারই জন্যে এর মতো কোন শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, আর আমাকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকেই গ্রহণ করে (মার্ক ৯ঃ৩৩-৩৭)।

(৩) ভালবাসা ঃ "শাস্ত্রীদের একজন তখন এগিয়ে এলেন। তিনি তাঁদের ওই আলোচনা শুনেছিলেন আর লক্ষ্যও করছিলেন, কেমন সুন্দর ভাবে যীশু উত্তর দিয়েছেন। তিনি তখন যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ" "আচ্ছা, (বিধানের) সমস্ত আদেশের মধ্যে প্রধান কোনটি?" (উত্তরে যীশু বললেনঃ "প্রধান আদেশটি হল এই- শোন, ইস্রায়েল ঃ আমাদের ঈশ্বর প্রভুই একমাত্র প্রভু" আর তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি তাঁকে তুমি ভালবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে, আর তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে।"

দ্বিতীয় প্রধান আদেশটি হল এই ঃ "তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালবাসবে। এই দুটির চেয়ে বড় কোন আদেশ আর নেই"। সেই শাস্ত্রী তখন যীশুকে বললেন ঃ "ঠিক কথা গুরু, আপনি ঠিকই বলেছেন যে, ঈশ্বর অনন্য। তিনি ছাড়া আর কোন দেবতাই নেই! সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকেও নিজের মতোই ভালবাসা, সে তো সমস্ত পূর্ণাহুতি ও বলিদানের চেয়ে অনেক ভাল!" তাঁর এই মন্তব্য যে কত সুবিবেচিত, তা লক্ষ্য করে যীশু তাকে বললেন, "আপনি ঐশ রাজ্যে থেকে আর বেশী দূরে নেই" (মার্ক ১২ঃ২৮-৩৩)।

আমি যদি মানুষের ও স্বর্গদূতের ভাষায় কথা বলতে পারি, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালবাসা, তাহলে আমি ঢংঢংগানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতাল ছাড়া আর কিছুই নই! আর আমি যদি প্রাবক্তিক বাণী ঘোষনা করতে পারি! যদি উপলব্ধি করতে পারি সমস্ত রহস্যাবৃত সত্য, জানতে পারি ধর্মজ্ঞানের সমস্ত কথা, যদি আমার অন্তরে থাকে পর্বত সরিয়ে দেবার মতো পূর্ণ বিশ্বাস, অথচ অন্তরে না থাকে ভালবাসা, তাহলে আমি তো কিছুই নই!.....আর আমি যদি আমার সমস্ত কিছু

দীনদারিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিই, এমন কি আমার নিজের দেহও আগুনে সঁপে দিই, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালবাসা, তাহলে তাতে আমার কোন লাভই নেই!.....

ভালবাসা নিত্য-সহিষ্ণু, ভালবাসা স্নেহ-কোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা। ভালবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না, রুক্ষও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজীও নয়। পরের অপরাধ সে কখনো ধরেই না। অর্ধমে সে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ। ভালবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখে দেখে ও তার বিশ্বাস সীমাহীন, সীমাহীন তার আশা ও তার ধৈর্য।

ভালবাসার মৃত্যু নেই। প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা? তা তো একদিন মূল্যহীন হয়ে যাবে। অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলা? তা তো একদিন শেষ হয়ে যাবে। ধর্মীয় জ্ঞান? তা-ও তো মূল্যহীন হয়ে যাবে, কারণ আমাদের সমস্ত জানা-ই অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ আমাদের সমস্ত প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা। কিন্তু যা পূর্ণ, তা যখন আসবে, তখন শিশুর মতো কথা বলতাম, শিশুর মত ভাবতাম, শিশুরই মতো বিচার করতাম। কিন্তু যখন মানুষ হয়ে উঠলাম, তখন শিশুর সব-কিছুই আমি বাদ দিয়ে দিলাম। তখন আমরা যেন দেখছি দর্পনের মধ্য দিয়ে, ঝাপসা ভাবে; কিন্তু তখন আমরা দেখতে পাব মুখোমুখি হয়ে। এখন আমি জানছি আংশিকভাবে, কিন্তু তখন চিনতে পারব পরিপূর্নভাবে, ঈশ্বর যেমন পরিপূর্ণভাবেই আমাকে চিনেছেন।

আপাতত বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা, এই তিনটিই থেকে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ভালবাসা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ।" (১ করি ১৩ঃ১-১৩)।

বৌদ্ধ ধর্ম ঃ

সদস্য স্তরে ইতোপূর্বে তোমরা ঈশ্বরের মহাত্মসূচক স্তবস্তোত্র ও প্রার্থনা, বুদ্ধ বন্দনা, ধর্ম বন্দনা, সংম বন্দনা, কঠিন চীবর দান, প্রবারণা, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ বইয়ের উপোসথ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রোগ্রেস ব্যাজ স্তরে শীল, পঞ্চাশীল প্রার্থনা, ত্রিশরণ, পঞ্চাশীল, অষ্টশীল প্রার্থনা, দশশীল প্রার্থনা ও দশশীল সম্পর্কে শিখেছ। এই স্তরে নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে শিখবে ও অনুশীলন করবে।

চতুরার্য সত্য ঃ সুখ ও দুঃখ মানুষের জীবনে আলোছায়ার মত দৃশ্যমান। ধূলার ধরণীতে সুখের চেয়ে দুঃখের মাত্রাই অধিক। শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

দুক্খমেব হি সম্ভোতি দুক্খং তিট্ঠতি বেতি চ,
নাঞ্ঞএ দুকখা সম্ভোতি নাঞ্ঞং নিরুজ্ঝতী'তি।
জগতে কেবল দুঃখ সত্যেরই উৎপত্তি ও বিলয় হয়।
দুঃখ ব্যতীত অপর কিছু উৎপন্ন হয় না, নিরোধও হয় না।

জগতে সুখানুভূতি বিদ্যুৎঝলকের মত মানুষের মনোরাজ্যে অস্থায়িত্বের চিহ্ন এঁকে দেয়। তা স্থায়িত্বের বেদনায় পীড়িত। মানব জীবন যেন এক দুঃখের সমুদ্র। সেই সমুদ্রের তরঙ্গ জীবন বেলাভূমিতে নিরন্তর আছড়ে পড়ে। দুঃখানুভূতির মর্মদাহে জীবন প্রতিনিয়তই দগ্ধ হচ্ছে। জননী জঠর থেকে আমৃত্যু অসংখ্য কামনা বাসনার অপূর্ণতায় তাকে দুঃখের ঘনান্ধকারে ডুবিয়ে রাখে।

জগৎ নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখময়। এটি বঙ্গ-ভারতীয় দর্শনের স্বীকৃত সত্য। ভগবান বুদ্ধ একে এক বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কারও কারও মতে সংসারে সুখও আছে। কিন্তু সেই সুখ ক্ষণস্থায়ী, সুখের পরিণাম দুঃখজনক। অদূরদর্শীর নিকট দুঃখও কোন কোন সময় সুখরুপে প্রতিভাত হয়।

অমধুরং মধুরুপেন প্রিয়রুপেন অপিয়ং
দুক্খং সুখস্স রুপেন পমত্তং অতিবত্ততি

অমধুর মধুররূপে, অপ্রিয় প্রিয়রূপে এবং দুঃখ সুখরূপে মূঢ় ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয়। সুতরাং সাময়িক সুখও পরিণামে দুঃখকর।

যুগে যুগে মহাপুরুষগণ দুঃখের এ সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করেছেন। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ বা গৌতম রাজকীয় বিলাসব্যসন ত্যাগ করে-এ দুঃখ মোচনের সন্ধানে কঠোর পরিশ্রম করেন। জন্ম জন্মান্তরের সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা তিনি যে সত্য উপলব্ধি করেন তাকে সংক্ষেপে "চতুরার্য সত্য" বলা হয়। এ চতুরার্য সত্যের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের সারতত্ত্ব নিহিত। বুদ্ধ নিজেই বলেছেন, "চতুসচ্চো বিনিমুত্তো ধম্ম নাম নথি।" অর্থাৎ, চতুরার্য সত্য ব্যতীত অপর কোন ধর্ম নেই।

চতুরার্য সত্য নিম্নরুপ ঃ (১) দুঃখ আর্যসত্য (২) দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য (৩) দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য (৪) দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

(১) দুঃখ আর্যসত্য- দুঃখ বহু প্রকার। যেমন-জন্ম দুঃখ, বার্ধক্য দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, শোক-পরিতাপ, দুর্মনতা ও উপায়াস দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ ও

প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ, পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ।

"দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং"

অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করাই দুঃখ।

(২) দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য- এটাই দুঃখের কারণ। তৃষ্ণাই পুনর্জন্মের হেতু। এটি কামনাকে আশ্রয় করে উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা অনুরাগ সহগত হয়ে রুপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শে আকৃষ্ট হয়। তাছাড়া এটি পুনর্জন্মকে আহ্বান করে। এ তৃষ্ণা ত্রিবিধ- কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। জরা ব্যাধি, মৃত্যু, অপ্রিয় সংস্পর্শ, প্রিয় বিয়োগ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ, তাকে আর ভোগ করতে হয় না। এটাই দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য।

(৩) দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য- তৃষ্ণার অবশেষ, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, মুক্তি, আশ্রয় নিরোধ বিহীনতা, নিবৃত্তিই নিরোধ সত্য। হেতু বশত মানুষ জন্মগ্রহণ করে। হেতু নিরদ্ধ হলেই জন্ম নিরুদ্ধ হয়। চক্ষু প্রসাদ, রুপালম্বন, চক্ষু বিজ্ঞান-এ তিনটির স্পর্শ হলে, মানুষ সুখ-দুঃখ অনুভব করে। সংস্পর্শ থেকে বেদনা বোধ হয়। বেদনা থেকে তৃষ্ণার উদ্ভব হয়। তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদনের কারনে কর্মভব সজ্ঞাত হয়। এভাবেই জন্ম জরা ব্যাধি, শোক, দুঃখ দৌর্মনস্য প্রভৃতি দুঃখের উদ্ভব হয়।

দুঃখ সত্য জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। দুঃখ সত্যে প্রকৃষ্ট জ্ঞাত হলেই মানুষ "নিরোধ" বা "নিবার্ণ" লাভ করতে সক্ষম হয়। দুঃখ নিরোধের অপর নাম নিরোধ সত্য।

দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা আর্যসত্য-আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। এটি মোট আট প্রকার। যথাঃ সম্যক দুষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক-বাক্য, সম্যক-কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

❒ স্কাউট দক্ষতা

(১) দড়ির কাজ

শিয়ার লেগ তৈরী (SHEAR LEG MAKING) ঃ

দু'টি বাঁশ বা দন্ডের নীচের অংশ সমান্তরাল রেখায় রেখে দু'টি বাঁশ বা দন্ডকে একত্র করে উপরের যেকোন একটি বাঁশ বা দন্ডে দড়ির স্থির প্রান্ত দিয়ে একটি ক্লোভ হিচ বা বড়শী গেরো বাঁধ। ক্লোভ হিচ বা বড়শী গেরো বাঁধার পর দড়ির স্থির প্রান্তের যে বাড়তি অংশ থেকে যাবে তাকে দড়ির চলমান অংশের সাথে পেঁচিয়ে দাও। এবার দড়ির চলমান অংশ দিয়ে দু'টি বাঁশ বা দন্ডকে একত্র করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নীচে থেকে উপরে চলে যাও। লক্ষ্য রাখবে যেন দুই বাঁশ দন্ডের সাথে প্যাঁচানোর সময় একটি দড়ি যেন অপর দড়ির সাথে লেগে থাকে, একটি দড়ি যেন অপর একটি দড়ির উপরে উঠে না যায় এবং সেখানে যেন কোন ফাঁকা না থাকে। আট-দশবার প্যাঁচানো শেষ হলে দুই বাঁশ বা দন্ডের মাঝখানে দড়ির যে অংশ আছে তাকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে শক্ত করে অন্ততঃপক্ষে ৩-৪ বার পেঁচিয়ে দাও। দুই বাঁশ বা দন্ডের মাঝখানের দড়িকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে প্যাঁচানকে ফ্র্যাপিং (FRAPPING) বলে। ফ্রাপিং যত শক্ত হবে ল্যাশিং তত মজবুত বা শক্ত হবে। ফ্র্যাপিং দেয়া শেষ হলে প্রথমে যে বাঁশ বা দন্ডে হিচ বা বড়শী গেরো দিয়ে ল্যাশিং শুরু করেছিলে তার বিপরীত বাঁশ বা দন্ডে ক্লোভ হিচ বা বড়শী গেরো বেঁধে ল্যাশিং শেষ কর। এভাবে শিয়ার লেগ তৈরী করার জন্য পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং (POLL & SHEAR LASHING) বাঁধতে হয়।

১ ২ ৩

শিয়ার লেগ তৈরী করার জন্য পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং (POLL & SHEAR LASHING) ব্যবহার করা হয়। অনেকে এই ল্যাশিংকে কেবলমাত্র শিয়ার ল্যাশিং বলে।

ট্রাসেল ঃ

ট্রাসেল তৈরী করতে আমরা দুই ধরণের ল্যাশিং ব্যবহার করে থাকি। যথা ঃ স্কয়ার ল্যাশিং ও ডায়াগোনাল ল্যাশিং। ট্রাসেল সাধারনত ব্রীজ তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এর মাধ্যমে টাওয়ার তৈরী করা সম্ভব।

ট্রাসেলের বিভিন্ন অংশের নাম ঃ

(২) কোড ও সাইফার ঃ

কোড ও সাইফার স্কাউটদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সেই সাথে অত্যন্ত আনন্দদায়ক খেলাও বটে। এই খেলার মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমান বুদ্ধির বিকাশও ঘটে। কোড ও সাইফার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রথমে কয়েকটি বিষয় জেনে নিতে হবে।

কোড (Code) ঃ কোন অক্ষর বা শব্দ যার গোপন অর্থ আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়, অর্থাৎ কোন খবরকে গোপন করে পাঠানোর জন্য যে বর্ণ বা শব্দসমূহকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করা হয় তাই কোড।

সাইফার (Cipher) ঃ সাইফার মানে শূন্য বা অর্থহীন। কোন লেখা বা খবরকে অন্যের কাছ থেকে গোপন করে তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছে পাঠাবার পদ্ধতিকে সাইফার বলে। অর্থাৎ যে পাবে এবং যে দেবে, এ দুজন ছাড়া অন্যের কাছে সেই লেখাগুলি অর্থহীন বলে মনে হবে।

টেক্স বা মূল (Text) ঃ মূল বলতে বুঝায় যে কোড অক্ষর বা শব্দের আদি রুপ অর্থাৎ যে বর্ণ বা শব্দ সমূহকে কোড করা হয়েছে।

ডিকোডিং (Decoding) ঃ আগে থেকে ঠিক করে রাখা নিয়মানুযায়ী পাঠানো কোডকে বদলিয়ে সাইফার থেকে মূল বার্তা পুনরুদ্ধার করাকে ডিকোডিং বলে। নিকট অতীতেও শত্রুর চোখ এড়িয়ে খবর পাঠানোর জন্য কোড ও সাইফার ব্যবহার করা হত। বর্তমানে এর নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে যার মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকটিকে নিয়ে এই পর্বে আলোচনা করা হবে।

ক) বদলা সাইফার/অক্ষরের স্থলে সংখ্যা (Numbers for Letter) ঃ এই নিয়মে ০১ সংখ্যা দিয়ে ইংরেজী অক্ষর "A" ০২ সংখ্যা দিয়ে অক্ষর "B" ইত্যাদি বুঝান হয়ে থাকে। ছকে সাজালে নিম্নরুপ হয় ঃ

সাইফার-	০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
মূল-	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
সাইফার-	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬		
মূল-	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		

উদাহরণ ঃ SEND SIXTEEN SCOUTS খবরটি সাইফারে লিখতে হলে S এর বদলে ১৯, E এর বদলে ০৫, N এর বদলে ১৪, D এর বদলে ০৪ ইত্যাদি বসালে সাইফারটি হবে ১৯০৫১৪০৪ ১৯০৯২৪২০০৫০৫১৪ ১৯০৩১৫২১২০৯১ তেমনিভাবে কোড পেলে ০৩১৫১৩০৫ ২০১৫০৪০১২৫ প্রতিটি জোড়া সংখ্যার নিচে অক্ষর নিলে দাঁড়াবে COME TODAY.

খ) উল্টা বর্ণমালা (Reverse Alphabet) পদ্ধতি ঃ এতে বর্ণমালাকে পেছন থেকে লিখতে হবে, Z অক্ষর হবে A, Y অক্ষর হবে B, X হবে C ইত্যাদি।

সাইফর-	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M
মূল-	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N

সাইফার-	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
মূল-	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

উদাহরণ ঃ MEET PATROL LEADER AT FIVE খবরটি পাঠাতে হলে M এর বদলে N, E এর বদলে V, T এর বদলে এ লিখলে তাতে MEET এর বদলে হবে NVVG এভাবে খবরটি হবে NVVG KZGILO OVZWVIZG UREV এভাবে সাইফার পেলে WL MLG TL ডিকোড করলে পাওয়া যাবে DO NOT GO.

গ) উল্টা হরফ কোড

এই পদ্ধতিতে যে খবরটিকে কোডে রূপান্তরিত করতে হবে তার শব্দগুলোকে উল্টাকারে লিখতে হয়। যেমনঃ- WE LOVE SCOUTING এ বাক্যটির সাইফার হবে, EW EVOL GNITUOCS & AKAHD সাইফারটি ডি-কোড করলে পাওয়া যাবে, DHAKA.

ঘ) জায়গা বদল চাবি শব্দ কোড

এই পদ্ধতিতে প্রথম একটি চাবিশব্দ নিয়ে বর্ণমালার ক্রমানুসারে পরপর নম্বর দিয়ে সাজিয়ে নিতে হয়। যেমন- চাবি শব্দটি MOHAMMEDAN হলে এটিকে সাজাতে হয় এভাবে-

M	O	H	A	E	D	N
5	7	4	1	3	2	6

অর্থাৎ শব্দের কোন বর্ণকে দুইবার ব্যবহার করা যাবে না।

সাইফার শব্দ তৈরীর জন্য সংখ্যার নিচে চাবি শব্দের অক্ষরগুলো লিখে পরবর্তীতে বর্ণমালার অন্যান্য বর্ণগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজাতে হয়। যেমন-

সংখ্যাঃ-	5	7	4	1	3	2	6
চাবি শব্দঃ-	M	O	H	A	E	D	N
বাকী অক্ষরঃ-	B	C	F	G	I	J	K
	L	P	Q	R	S	T	U
	V	W	X	Y	Z		

এখন সাজানো বর্ণমালাগুলো ধারাবাহিক সংখ্যার কলাম ধরে উপর থেকে নিচে

সাজিয়ে নিতে হয়। অর্থাৎ- 1 এর নিচে আছে AGRY, 2 এর নিচে DJT, 3 এর নিচে EISZ ইত্যাদি। এভাবে সাইফার ও মূল বর্ণের যে ছক তৈরী হবে তা হচ্ছে-

সাইফার -	A	G	R	Y	D	J	T	E	I	S	Z
মূল -	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
সাইফার -	H	F	Q	X	M	B	L	V	N	K	U
মূল -	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
সাইফার -	O	C	P	W							
মূল -	W	X	Y	Z							

এই ছকের সাহায্যে ROBIN IS A SCOUT বাক্যটিকে কোড করলে সাইফার হবে LXGIQ IV A VRXKN আবার VRXKN HDAYDL সাইফারটিকে ডি-কোড করলে পাওয়া যাবে- SCOUT LEADER.

জায়গা বদল (Transposition method) :

এ পদ্ধতিতে মূল বিষয় গোপন করার জন্য অক্ষরগুলো উল্টো পাল্টা করে আগে থেকে ঠিক করা নিয়মে লিখতে হয়। এটি অনিয়মিত বা Irregular এবং নিয়মিত বা regular এ দু'পদ্ধতিতে বিভক্ত ঃ

(ক) অনিয়মিত পদ্ধতি ঃ এক্ষেত্রে শব্দের অক্ষরগুলো উল্টা করে লেখা হয়।

যেমন ঃ

I SHALL ATTEND THE MOOT বার্তাটি লিখতে হয় নিম্নরূপ ঃ

I LLAHS DNETTA EHT TOOM.

(খ) নিয়মিত পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত কোডটি-

AFEIIRMSQT BNFAJTNIROTNUAVL

CRMOKVOESR DMHOLOPT

ডিকোটিং করে সঠিক বার্তাটি পাওয়া যাবে FIRST NATIONAL ROVER MOOT.

এখানে প্রতিটি শব্দের অর্ন্তগত প্রতিটি মূল অক্ষরের আগে একটি করে মনগড়া অক্ষর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় গণনা করলে প্রতি জোড়ার শেষ অক্ষরটি হচ্ছে প্রকৃত অক্ষর যার মূল বার্তাটি সঠিকভাবে লিখা হয়েছে। যেমন FIRST শব্দের F অক্ষরের আগে মনগড়া A, I এর আগে E, R এর আগে I ইত্যাদি বসানো হয়েছে।

(৩) স্কাউট পতাকা

জাতীয় স্কাউট পতাকা ঃ

বাংলাদেশ স্কাউটসের পতাকা গাঢ় সবুজ জমিনে আয়তাকার হবে। পতাকার দৈর্ঘ্য হবে এক মিটার ছত্রিশ সেঃ মিঃ ও প্রস্থ হবে নব্বই সেঃ মিঃ। পতাকার দৈর্ঘ্য হবে এক মিটার ছত্রিশ সেঃ মিঃ ও প্রস্থ হবে নব্বই সেঃ মিঃ। পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাঝখানে বাংলাদেশ স্কাউটসের মনোগ্রাম খচিত থাকবে। মনোগ্রামের বাইরের বৃত্তের ব্যাস হবে ৪৫.৫ সেঃ মিঃ এবং ভেতরের ব্যাস হবে সাড়ে ৩০.৫ সেঃ মিঃ। মনোগ্রাম সবুজ ত্রি-পত্র এবং লাল ক্রিসেন্টের ভেতরের অংশ সাদা রং এর হবে। লাল ক্রিসেন্টের উভয় পার্শ্বে বৃত্তাকারে সবুজ রংয়ের ০.২ সেঃ মিঃ মাপের চওড়া রেখা থাকবে।

পতাকার রং-এর তাৎপর্য ঃ

সবুজ ত্রি-পত্রক ঃ গ্রাম বাংলার সবুজ পরিবেশের প্রতীক ও প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশ। মাঝের ছোট ছোট দাগগুলো বিশ্ব ভাতৃত্বের প্রতীক।

লাল বৃত্ত ঃ উদিয়মান সূর্য ও স্বাধীনতার প্রতীক।

লাল অর্ধবৃত্ত ঃ সেবার প্রতীক।

সাদা অংশ ঃ শান্তির প্রতীক।

অঞ্চল পতাকা ঃ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর তালিকাভূক্ত সকল অঞ্চলের পতাকার মাপ জাতীয় স্কাউট পতাকার অনুরুপ হবে। পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাঝখানে স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে এবং তার নীচে সোজা লাইনে ৭.৫ সেঃ মিঃ চওড়া মাপে অঞ্চলের নাম লেখা থাকবে।

ক) রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের পতাকার ও লেখার রং হবে নিম্নরূপঃ

১. রোভার অঞ্চলের পতাকার কাপড় হবে গাঢ় লাল রংয়ের এবং অঞ্চলের নাম সোনালী রংয়ে লেখা থাকবে।

২. রেলওয়ে অঞ্চলের পতাকার কাপড়ের রং হবে রেলওয়ে ব্লু এবং অঞ্চলের নাম সোনালী রংয়ে লেখা থাকবে।

৩. নৌ অঞ্চলের পতাকার কাপড়ের রং হবে নেভী ব্লু। সোনালী রংয়ে অঞ্চলের নাম লেখা থাকবে। পতাকার মাঝখানে নৌ স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

৪. এয়ার অঞ্চলের পতাকার কাপড়ের রং হবে আকাশী নীল। সোনালী রংয়ের অঞ্চলের নাম লেখা থাকবে। পতাকার মাঝখানে এয়ার স্কাউট মনোগ্রাম থাকবে।

খ) রোভার, রেলওয়ে নৌ ও এয়ার ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের পতাকার রং হবে গাঢ় সবুজ এবং অঞ্চলের নাম সোনালী রং এ লেখা থাকবে।

জেলা/উপজেলা ও মেট্রোপলিটন স্কাউটস পতাকাঃ

অঞ্চলের পতাকার অনুরুপ হবে অঞ্চলের নামের স্থানে উপজেলা/জেলার নাম থাকবে।

➢ **রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার জেলা স্কাউটস পতাকা ঃ** সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পতাকার রংয়ের অনুরুপ হবে। সোনালী রং-এ জেলার নাম লেখা থাকবে।

(৪) অনুমান

কম্পাস ব্যতিত অন্য পদ্ধতিতে দিক নির্ণয় ঃ

কম্পাস ব্যবহার সম্বন্ধে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজে তোমাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে কম্পাস ছাড়াও যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দিক নির্ণয় সম্ভব তা জানবে।

তারার সাহায্যে ঃ আকাশের সর্ব উত্তরে একটি নক্ষত্রকে মিটমিট করে উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে দেখা যায়। পৃথিবীর ঘূর্ণন এবং এই নক্ষত্রটির ঘূর্ণনের গতির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকায় মনে হয় নক্ষত্রটি একবারে স্থির। এই নক্ষত্রটি দীর্ঘকাল এই অবস্থায় অবস্থান করছে। তাই একে ধ্রুব তারা বলে। দিক নির্ণয়ের জন্য নক্ষত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লাংগেলের দুইটি তারকা ধ্রুব তারা প্রদর্শন করে

সপ্তর্ষি মন্ডল ঃ উত্তর আকাশে সাতটি তারার সমন্বয়ে গঠিত প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত একটি নক্ষত্রপুঞ্জ পরিলক্ষিত হয়। একে সপ্তর্ষিমন্ডল বলে। এই চিহ্নের মাথার দুটি তারাকে একলাইনে যোগ করে বরাবর রেখা টানলে তা ধ্রুব তারায় গিয়ে পড়ে। এই রেখায় ধ্রুবতারা বরাবর গতিপথই উত্তর দিক নির্দেশ করে।

আদম সুরত বা কালপুরুষ ঃ সাধারণত শীতকাল ছাড়া বছরের অন্যান্য ঋতুতে আকাশের দক্ষিণ দিকে মানুষের আকৃতির ন্যায় একটি নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা যায়। এর কোমরে পাশাপাশি তিনটি তারা রয়েছে তলোয়ারের আকৃতিতে। এই তিনটি তারা এক সাথে কটি এবং পুরো নক্ষত্রপুঞ্জটি আদম সুরত নামে পরিচিত। কটির মাঝের তারাটিকে নিয়ে মাথার তিনটি তারা মাঝামাঝি বরাবর রেখা টানলে তা উত্তর দিক নিদের্শ করবে এবং এই রেখাটিকে আরো টানলে তা ধ্রুব তারায় গিয়ে পড়বে।

ওরিয়নের মধ্য দিয়া একটি রেখা টানিলে অবশেষে ধ্রুবতারায় পৌছাইবে

ঘড়ির সাহায্যে ঃ ঘড়ি কম্পাসের বিকল্প যন্ত্র হিসাবে দিক নির্ণয় কাজে লাগে। বেলা বারটা ছাড়া যে কোন সময়ে উন্মুক্ত স্থানে যেয়ে লক্ষ্য

করতে হবে সূর্য কি অবস্থানে আছে। ইহা করিতে হইলে তোমার হাত ঘড়িটির সম্মুখভাগে উপরের দিক করিয়া ধর, উহার উপর যেন সূর্যরশ্মি পতিত হয়। তারপর ঘড়িটিকে ঘুরাইতে থাক। যখন দেখিবে ঘন্টার কাটাটি সূর্যের ঠিক উপরে আসিয়াছে, তখনই থাম, কেন্দ্র থেকে ১২ সংখ্যাটি পর্যন্ট একটি কাল্পনিক রেখা অংকন করার পরে ঘন্টার কাঁটার সাথে উক্ত রেখার সমন্বয়ে একটি কোণ উৎপন্ন হইলো। এইবারে একটা পেন্সিল কিংবা কাঠি দিয়া সেই কোণটিকে সমান দুইভাগে বিভক্ত কর। সেই পেনসিলটি যে দিক নির্দেশ করে উহাই দক্ষিণ দিক। কেবলমাত্র উত্তর গোলার্ধেই এই নিয়মটি খাটে। দক্ষিণ গোলার্ধের বেলায় ঘন্টার কাটার পরিবর্তে ১২ সংখ্যাটি সূর্যের দিকে ঘুরাইয়া ঠিক কর। তারপর আগের মত উৎপন্ন কোণটিকে ভাগ করিলেই দক্ষিণ দিক পাইবে।

আকাশে সূর্য দেখা গেলে ঘড়ির সাহায্যে দিক নির্ণয় করিতে পারিবে

বাতাসের গতি ঃ এই পদ্ধতি ব্যবহারের আগে মৌসুমী বাতাসের গতি কোন দিকে থাকে তা ভালোভাবে আয়ত্ব করতে হবে। যখন বাতাসের গতি ভালোভাবে অনুভব করা যাবে না স্বাভাবিক অবস্থায়, তখন যা করতে হবে গতির দিক নির্ণয়ের জন্য, তা হচ্ছে ঃ

- কিছু ধুলো হাতে নিয়ে উপর থেকে নিচে সোজা ফেলে দিতে হবে এবং লক্ষ্য করতে হবে তা কোনদিকে উড়ে যায়, অথবা
- যে কোন দু'টি আঙ্গুল মুখে দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে সোজা করে ধরতে হবে এবং লক্ষ্য করতে হবে কোন দিকে বেশি ঠান্ডা মনে হয়, বাতাস যেই দিক থেকে বইছে সেই দিকেই ঠান্ডা বেশী লাগবে।

মসজিদ ঃ মুসলমানদের প্রার্থনা কেন্দ্র হচ্ছে মসজিদ। এটি পূর্ব দুয়ারী ঘর। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং মেহরাব পশ্চিম দিকে থাকে।

মন্দির, গীর্জা ঃ সাধারণত মন্দির দক্ষিণ দুয়ারী এবং গীর্জা পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হয়। গীর্জার উপরের ক্রস চিহ্ন পশ্চিম দিকে হয়।

(৫) সংকেত

সিমাফোর (Semaphore) সংকেত ঃ

সংকেত প্রেরণ একটা সহজ পন্থা আছে। উহার নাম সিমাফোর সংকেত। হাত দুইটাকে ঘুরাইয়া বিভিন্ন প্রকারের কোণ সৃষ্টি করতঃ এই সংকেত করা হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে দুই হাতের দ্বারা তৈরি ভিন্ন ভিন্ন কোণের দ্বারা অক্ষর গঠন করা হয়। তবে কোণগুলি সঠিকভাবে তৈরি হইতে হইবে। নিম্নের নকসা দেখিয়া সংকেতগুলি বুঝিতে পারিবে। ছবিতে যদিও কিছুটা জটিল দেখাইবে, প্রকৃতপক্ষে কাজের সময় দেখিতে পাইবে যে, এগুলি খুবই সহজ। যেখানে বা যাহার কাছে সংবাদ পাঠান হইতেছে, প্রেরক সেদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে। গ্রহণকারী মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আহ্বান করার সংকেত VE-VE অথবা AAAA সর্বপ্রথম পাঠাইতে থাকিবে। বার্তা গ্রহণকারী প্রস্তুত হইলে K-র দ্বারা সংকেত করিবে 'সুরু-কর'। যদি সে তৈরি না হইয়া থাকে তখন সংকেত করিবে Q অর্থ্যাৎ অপেক্ষা কর।

গ্রহণকারী শব্দটির সঠিকভাবে ধরিতে পারিলে C বা A সংকেত করিবে। কোন শব্দের জওয়াব না পাইলে বার্তা প্রেরককে বুঝিতে হইবে যে প্রাপক শব্দটি ধরিতে পারে নাই। সুতরাং উহার জওয়াব না পাওয়া পযন্ত প্রেরককে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। যদি শব্দ প্রেরণের ভুল হয়, তখন বাতিল সংকেত অর্থ্যা ৮-E-র সংকেত করিবে এবং সঠিক শব্দটির পুনরাবৃত্তি করিবে। সিমাফোরে সংখ্যাগুলি বানান করিয়া বর্ণের সাহায্য পাঠাইতে হইবে। সংখ্যাক প্রেরণের শেষে প্রাপক সংখ্যাগুলিরপুরণরাবৃত্তি করিয়া উহাদের সত্যতা যাচাই করিয়া লইবে।

ধ্বনি- সংকেত ও আলো সংকেত-এ শব্দের সমাপ্তি বুঝান হয়, স্বপ্ন স্থায়ী বিরতির দ্বারা। পতাকা সংকেত-এ পতাকা দুইটি সামনে নামাইয়া সমাপ্তি বুঝান হয়।

সংকেত	অর্থ এবং ব্যবহার
VE, VE, VE অথবা AAAA	আহ্বান সংকেত
K	শুরু কর (বার্তা গ্রহণের প্রস্তুতি জ্ঞাপন, VE এর উত্তর)
T বা E (মোর্স্)	সাধারণ জওয়াব। (অন্য রকম ধার্য না থাকিলে সব সংকেতের পর ব্যবহৃত হয়।)
C বা A (সিমাফোর)	মুছিয়া ফেল (ভুল হইয়াছিল)
৮ টি ডট (বিন্দু) বা ৮টি E (সিমাফোর)	
AR	সমাপ্তি।
R	ঠিক। (সংবাদ সঠিকভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে; AR এর উত্তর)

পূর্ণ সংবাদের সমাপ্তি সংকেত হইল AR সংবাদ নির্ভূলভাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে প্রাপক R সংকেতের সাহায্যে সমাপ্তি ঘোষণা করিবে।

সিমাফোর বর্ণমালা শিক্ষা হইয়া গেলেই রীতিমত অভ্যাসের প্রয়োজন হইবে। স্কাউটদের খুব দীর্ঘ বাক্যে কিংবা অতিদূরবর্তী স্থানে অথবা খুব দ্রুত গতিতে সংবাদ পাঠান দরকার করেনা। তোমাদের পক্ষে শুধুমাত্র বর্ণমালা শিখিয়া ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যে সংবাদ পাঠাইতে এভং বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে। ভাল করিয়া চেষ্টা করিবে, যাহাতে প্রয়োজনমত বিস্তৃত মাঠের এক পাশ হইতে অন্য পাশে কিংবা পাহাড়ের এক চূড়া হইতে অন্য চূড়ায় সংবাদ অতি সহজেই আদান প্রদান করিতে পার এবং প্রাপকের পক্ষে বুঝিতে কষ্ট না হয়।

অনেক সময় গোপন সংকেত লিখিত চিঠি দ্বারা অন্য লোকের তাক লাগাইয়া দিতে মন চাহেনা কি? এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ বর্ণমালার সাহায্যে না লিখিয়া সিমাফোর বা মোরস বর্ণমালায় চিঠি লিখিয়া পাঠাও। সাধারণ লোকে এর বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিবেনা, অথচ যাহাদের সংকেত জানা আছে তাহারা অতি সহজেই সবটুকু বুঝিয়া লইতে পারিবে।

দুইটি নিশান বিভিন্ন কোণে ধরিয়া সিমাফোর অক্ষর গঠিত করা হয়।

(৬) উপস্থিত বক্তৃতা

সাধারণত কোন প্রস্তুতি ছাড়াই এই বক্তৃতা হয়ে থাকে। বেশি বেশি উপস্থিত বক্তৃতা চর্চার একজন স্কাউটের বুদ্ধির ও মানসিক বিকাশ ত্বরান্বিত করে। সেই সাথে জানার আগ্রহ ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। স্কাউটরা নিজ নিজ ইউনিটে এর চর্চা করবে। মাঝে মধ্যে প্রতিযোগীতার আয়োজন করা যেতে পারে।

যা যা করতে হবে

- প্রথমে দরকার হবে বিচারকের। এক বা একাধিক থাকতে পারেন। স্কাউট লিডার এর ব্যবস্থা করবেন অথবা নিজে বিচারক হিসেবে থাকতে পারেন।
- এরপর লাগবে কতগুলো বিষয়। যা নির্ভর করবে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যার উপর। অসম্ভব হলে যতজন অংশগ্রহনকারী থাকবে তার থেকে বেশী বিষয় রাখতে হবে। এমন ভাবে রাখতে হবে যেন তা বাইরে থেকে গড়া না যায়।
- কোন পাত্রে বা স্থানে বিষয়গুলো রাখতে হবে। প্রথম একজন স্কাউট এসে যে কোন একটি বিষয় সংগ্রহ করে স্কাউট লিডারকে দেখাবে এবং ৩ মিনিট বিষয়টি নিয়ে ভাববে এবং ০৩ মিনিট পর বিষয়টি সম্পর্কে বক্তৃতা করবে। প্রথমজন বক্তৃতা শুরু করতেই অপর একজন এসে একটি বিষয় সংগ্রহ করবে এবং সেই বিষয়ে ভাবতে থাকবে। যেহেতু প্রথমজনের বক্তৃতার সময় ৩ মিনিট তাই পরেরজনও ভাবার জন্য ৩ মিনিট সময় ভাবেন। এভাবেই একের পর এক স্কাউট বক্তৃতা করবে। সবার বক্তৃতা শেষ হলে বিচারক উপস্থিত বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবেন এবং ফলাফল ঘোষনা করবেন।

❒ জীবন শিক্ষা ও সমাজ সেবা

(১) স্কাউট সেবা ঃ

ক) কুষ্ঠ (Leprosy)

কুষ্ঠ রোগ কি ঃ (Mycobacterium leprae) নামক জীবানুর সংক্রমনের কারণে কুষ্ঠ রোগ হয়। কুষ্ঠ রোগ মস্তিষ্ক ও মেরুদন্ডের বাইরের দিকে স্নায়ু (Peripheral Nerves), ত্বক, অন্ডকোষ (testes), চোখ এবং নাকের মিউকাস মেমব্রেনের ক্ষতি করে।

কুষ্ঠ রোগ যে কোন বয়সেই হতে পারে। তবে ৫-১৫ বছর বয়সী অথবা ৩০ এর বেশি বয়সীদের এই সমস্যা দেখা দেয়।

কুষ্ঠ রোগ কিভাবে ছড়ায় ঃ

১। আক্রান্ত ব্যক্তির নাক- মুখ দিয়ে (Droplet) ঝরলে এবং সুস্থ ব্যক্তির শ্বাস নেয়া ও স্পর্শের মাধ্যমে কুষ্ঠ রোগ ছড়াতে পারে।

২। জীবানু দ্বারা সংক্রমিত হলেও অধিকাংশ ব্যক্তির কুষ্ঠরোগ হয় না। সাধারনত আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী মেলামেশার ফলে কুষ্ঠ রোগ হতে পারে। ক্ষণস্থায়ী মেলামেশার কারণে এটি ছড়ায় না।

৩। আক্রান্ত ব্যক্তিকে সাধারণত স্পর্শের মাধ্যমে এটি ছড়ায় না।

৪। কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জীন অনেক সময় সংক্রমনের জন্য দায়ী থাকে। ফলে জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত তাদের কুষ্ঠ রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে।

কুষ্ঠ রোগ হয়েছে কি করে বোঝা যায় ঃ

সংক্রমিত হওয়ায় অন্তত এক বছর আগ পর্যন্ত কোন লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা যায় না। সাধারণত সংক্রমনের ৫-৭ বছর পর কুষ্ঠ রোগের উপসর্গ গুলো দেয়া যায়। উপসর্গ গুলো ধীরে ধীরে বাড়ে।

কুষ্ঠ রোগ হলে সাধারণতঃ যেসব লক্ষণ ও উপসর্গ গুলো দেখা দেয় ঃ

১। টিউবারকিউলয়েড কুষ্ঠ (Tuberculoid Leprosy) : ত্বকে লালচে দাগের পাশাপাশি কিছু কিছু জায়গায় মসৃণ সাদাটে দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত স্থান অসাড় ঘন হয়ে যায়।

২। লেপরোমেটাস কুষ্ঠ (Lepromatous Leprosy) : ত্বকে অনেক ক্ষুদ্র পিন্ড অথবা অনেকখানি স্থান জুড়ে বিভিন্ন আকারের লালচে দাগ দেখা যায়। শরীরের বেশিরভাগ স্থান অসাড় হয়ে যায় এবং মাংসপেশী দূর্বল হয়ে পড়ে। ত্বকের বেশির ভাগ অংশ এবং শরীরের বেশিরভাগ অঙ্গ যেমন- কিডনী, নাক, অন্ডকোষ আক্রান্ত হতে পারে।

৩। বর্ডারলাইন কুষ্ঠ (Borderline Leprosy) : এক্ষেত্রে টিউবারকিউলয়েড কুষ্ঠ এবং লেপ্রোমেটাস কুষ্ঠের বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকে। চিকিৎসা না করানো হলে এটি অনেকটা টিউবারটিউলয়েড কুষ্ঠের মত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। যদি আরো খারাপ আকার ধারণ করে তাহলে লেপ্রোমেটাস কুষ্ঠের মত হতে পারে।

অন্যান্য উপসর্গ ঃ

১। স্পর্শ, ব্যথা ও তাপমাত্রার অনুভূতি হ্রাস পায়

২। যাদের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তারা মনের অজান্তেই নিজের ক্ষতি করতে পারে যেমন : শরীরের কোন জায়গায় পুড়ে যেতে পারে, কাটা অথবা অন্যভাবে বার বার ক্ষয়ের ফলে হাত ও পায়ের আঙ্গুল হারাতে পারে।

৩। ত্বকের যেসব স্থান সংক্রমিত হয় সেসব জায়গায় পিন্ড দেখা যায় বা ফুলে যায়।

কিভাবে কুষ্ঠ রোগ প্রতিরোধ করা যায় ঃ

১। আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে নিঃসৃত তরল (bodily fluid) এবং তাদের ত্বকের যে ফুসকুড়ি তার সংস্পর্শে আসা যাবে না।

২। বিসিজি টিকা নেবার মাধ্যমে কুষ্ঠ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। তবে এটা অতটা প্রচলিত নয়।

কুষ্ঠ রোগের ফলে নিচের জটিলতাগুলো দেখা দেয় ঃ

১। পায়ের নিচে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে যার ফলে হাঁটতে গেলে ব্যথা করে।

২। নাসিকাতে ক্ষতের কারণে নাকে সমস্যা হতে পারে এবং নাক থেকে রক্তপাত হতে পারে এমনকি নাক ক্ষয়ে যেতে পারে।

৩। চোখের ক্ষতির কারণে গ্লুকোমা অথবা অন্ধত্ব হতে পারে।

৪। পুরুষদের লেপ্রোমেটাস কুষ্ঠ হলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ (Erectile dysfunction / Impotence) এবং সন্তান জন্মদানে তারা অক্ষম (Infertile) হন।

৫। কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

কুষ্ঠ একটি নিরাময় যোগ্য রোগ

যক্ষ্মা

যক্ষ্মা কি?

যক্ষ্মা একটি জীবাণুঘটিত রোগ যা মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস (বা যক্ষ্মা জীবাণু) নামক জীবাণু দিয়ে হাঁচি-কাশির মাধ্যমে সংক্রমন হয়ে থাকে। যক্ষ্মা রোগ সংক্রমনের স্থান অনুযায়ী যক্ষ্মা দু'প্রকার। যেমন ঃ-

ক) Pulmonary TB বা ফুসফুসের যক্ষ্মা

খ) Extra-Pulmonary TB বা ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষ্মা

তবে ফুসফুসে আক্রান্ত যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক যা সমগ্র যক্ষ্মা রোগের ৮০% এর উর্দ্ধে। ফুসফুসের যক্ষ্মা দু'প্রকার যথাঃ

Pulmonary Smear Positive TB বা ফুসফুসের যক্ষ্মা জীবাণুযুক্ত রোগীঃ
যাদের কফের যক্ষ্মা জীবাণু পাওয়া যায়, এ ধরণের ফুসফুসের যক্ষ্মার মাধ্যমে রোগের সংক্রামণ ঘটে ও বিস্তার লাভ করে। সুতরাং যক্ষ্মা রোগের বিস্তার রোধ করতে এবং রোগীকে বাঁচাতে বিলম্ব না করে এ রোগের চিকিৎসা শুরু করা জরুরী।
Pulmonary Smear Negeitive TB বা ফুসফুসের যক্ষ্মা জীবাণুযুক্ত রোগীঃ
যাদের কফে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া যায় না অথচ ফুসফুসে যক্ষ্মা আছে এবং সুস্থ ব্যক্তির দেহে এ রোগ ছড়ায় না।

যক্ষ্মা রোগ কিভাবে ছড়ায় এবং ভয়াবহতা ঃ
যক্ষ্মা রোগীর কফ, হাঁচি-কাশির সাথে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু বের হয়ে বাতাসে মিশে ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে তা সুস্থ ব্যক্তির ফুসফুসে ঢুকে বংশ বৃদ্ধি করে। একজন যক্ষ্মা রোগী চিকিৎসা ছাড়া বছরে দশজন সুস্থ লোক আক্রান্ত করতে পারে। এভাবে সে তার পরিবারের সদস্য ও আশে-পাশের ব্যক্তিদের মাঝে এ রোগ ছড়াতে পারে।

ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ কি কি?
- এক নাগাড়ে তিন সপ্তাহ বা তার অধিক সময় ব্যাপি কাশি।
- জ্বর, বুকে ব্যথা, খাবারে অরুচি, শ্বাস কষ্ট ও ওজন কমে যাওয়া।
- সাধারণ এন্টিবাইওটিক দিয়ে এ কাশি নিরাময়যোগ্য নয়।

কখন একজন ব্যক্তিকে যক্ষ্মা রোগী হিসেবে সন্দেহ করা যেতে পারে?
নিম্নোক্ত লক্ষণগুলোর উপর ভিত্তি করে একজন ব্যক্তিকে যক্ষ্মা রোগী হিসেবে সন্দেহ করা যেতে পারেঃ
ক) তিন সপ্তাহ বা তার অধিক সময় ব্যাপি কাশি (কাশির সাথে রক্ত থাকুক বা না থাকুক)।
খ) কাশির সাথে জ্বর, বুকে ব্যথা, খাবারে অরুচি, শ্বাস কষ্ট, শরীর শুকিয়ে যাওয়া বা ওজন কমে যাওয়া থাকতে পোরে।
এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য যে, উপরে বর্ণিত লক্ষণগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র তিন সপ্তাহ বা তার অধিক সময় ব্যাপি কাশি থাকলে কোন ব্যক্তিকে যক্ষ্মা রোগী বলে

সন্দেহ করতে হবে এবং কফ পরীক্ষার জন্য নিকটস্থ উপজেলা হাসপাতালে/বক্ষব্যাধি ক্লিনিকে অথবা নির্দিষ্ট এনজিও ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে হবে অথবা প্রেরণ করতে হবে।

যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধঃ

যেহেতু যক্ষ্মা একটি সংক্রামক রোগ তাই এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর একটি অপরিহার্য শর্ত। এক্ষেত্রে যে সকল পদক্ষেপ সমূহ অনুসরণ যোগ্য-

১। রোগের সম্ভাব্য লক্ষণ প্রকাশ পেলে ডাক্তার / স্বাস্থ্যসেবিকা/ স্বাস্থ্যকর্মী / স্বেচ্ছাসেবকের পরামর্শ নেয়া।

২। রোগ সনাক্ত হলে অবিলম্বে চিকিৎসা শুরু করা এবং নিয়মিত, সঠিক মাত্রায়, ক্রমাগতভাবে ও পূর্ণ মেয়াদে ঔষধ সেবন করা।

৩। রোগীর কফ থুথু নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলা ও পরে তা পুতে/পুড়ে ফেলা।

৪। পরিবারের একজন রোগী হলে এবং পরিবারের অন্যদের যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ থাকলে তাদের কফ পরীক্ষা করানো।

৫। জন্মের পর পর শিশুকে বিসিজি টিকা দেয়া।

যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসাঃ

প্রতিটি উপজেলা হাসপাতাল ও ব্যক্ষব্যাধি ক্লিনিক এবং নির্দিষ্ট এনজিও ক্লিনিক- এ সম্পূর্ন বিনামূল্যে যক্ষ্মা রোগের পরীক্ষা ও চিকিৎসা পাওয়া যায়। নিয়মিত, সঠিক মাত্রায়, ক্রমাগত ও নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত ঔষধ সেবনের মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগ সম্পূর্নভাবে ভাল হয়। অনিয়মিত, অপর্যাপ্ত এবং অসম্পূর্ণ চিকিৎসায় যক্ষ্মা রোগ জটিল আকার ধারণ করে এবং পরবর্তীতে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা করলেও রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার সম্ভাবণা খুবই কম থাকে।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে চিকিৎসার ভূমিকা ঃ

নিয়মিত, সঠিক মাত্রায়, ক্রমাগত ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঔষুধ সেবনের ফলে যক্ষ্মা সম্পূর্ন নিরাময়ের মাধ্যমে এই রোগের সংক্রমনের হার কমিয়ে আনা সম্ভব এবং সফলভাবে যক্ষ্মা চিকিৎসা সম্পূর্ণ করার প্রক্রিয়া এই রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আর্সেনিক

আর্সেনিক একটি স্বাদহীন, গন্ধহীন, ভঙ্গুর মৌলিক পদার্থ। ইহা বায়ু, পানি, মাটি, উদ্ভিদ এবং প্রাণীসহ প্রকৃতির সর্বত্র বিরাজমান। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এটি খুবই

সক্রিয় এবং সহজেই অন্য পদার্থের সাথে বন্ধন তৈরি করতে পারে। একদিকে অক্সিজেন, ক্লোরিন, গন্ধক, কার্বন, হাইড্রোজেন অন্যদিকে সীসা, পারদ, সোনা, লোহার সঙ্গে যৌগরূপে আর্সেনিক অবস্থান করে। আর্সেনিক মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর এক ধরনের বিষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি লিটারে পানিতে আর্সেনিকের সহনীয়মাত্রা ০.০১ mg আর্সেনিক থাকলে তা পানের উপযোগী থাকে। তবে বাংলাদেশে প্রতি লিটারে ০.০৫ mg পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য। বাংলাদেশে কোন কোন অঞ্চলে নলকূপের পানিতে অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে ১০০ ভাগ বেশি আর্সেনিক মিশ্রন পাওয়া গেছে। আর্সেনিক রয়েছে এমন টিউবওয়েলের পানি খাওয়ার জন্য বিভিন্ন এলাকার মানুষ আর্সেনিকজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পানি বা অন্য কোন মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য মাত্রার অধিক পরিমাণে, আর্সেনিক দীর্ঘকাল কমপক্ষে ৬ মাস যাবৎ মানবদেহে প্রবেশ করলে চামড়ায় বিশেষ ধরণের লক্ষণ দেখা দেয় যাকে আর্সেনিকোসিস বলে। এতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হতে পারে এমনকি ক্যান্সার হতে পারে।

মানুষের শরীরে সাধারনত তিনভাবে আর্সেনিক প্রবেশ করতে পারেঃ

- প্রথমত-বাতাসের মাধ্যমে শ্বাসনালীর ভিতর দিয়ে।
- দ্বিতীয়ত-পানি ও খাদ্য দ্রব্যের মাধ্যমে খাদ্যনালীর ভিতর দিয়ে।
- তৃতীয়ত-ত্বকের মাধ্যমে শোষিত হয়ে শরীরে প্রবেশ করে।

আর্সেনিক কেন সমস্যাঃ

পানিতে আর্সেনিক বিষ থাকলে ও আমরা তা খালি চোখে দেখতে পাই না। এ কারণে আমরা না জেনেই অনেক সময় আর্সেনিক বিষ রয়েছে এমন নলকূপের পানি পান করি। আর এভাবে আর্সেনিক বিষ পান করার কারণে আমরা আর্সেনিকজনিত রোগে আক্রান্ত হই। পানি বা অন্য কোনো মাধ্যম হতে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি পরিমাণে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করলে, ধীরে ধীরে দেহে তা জমা হতে থাকে এবং মানুষের দেহে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া দেখা দেয়। মানুষের দেহে সাধারণত আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার লক্ষণ ৬ মাস থেকে ২০ বছর অথবা এর চেয়ে বেশী বছর পর দেখা যায়। এটি নির্ভর করে মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর।

আর্সেনিক দূষণ এলাকাঃ

এদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৯টি জেলার নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণ রয়েছে। শেরপুর, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই ৫টি জেলা এখনও আর্সেনিক দূষণমুক্ত বলে মনে করা হয়।

আর্সেনিক রোগীর লক্ষণসমূহঃ

কোনো ব্যক্তির চুল, নখ ও চামড়া পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে, সে আর্সেনিকে আক্রান্ত কিনা। তবে একেকজনের শরীরে আর্সেনিকের লক্ষণ প্রকাশ পেতে ৬ মাস থেকে ২০ বছর অথবা এর চেয়ে বেশি বছর সময় লাগে এবং তিনটি পর্যায়ে লক্ষণগুলো দেখা দেয়।

প্রথম পর্যায়ে অল্পমাত্রায় আর্সেনিক আক্রান্তদের ক্ষেত্রে যেসব লক্ষণ দেখা দেয় তা হলোঃ

- রোগীর গায়ে/যেমন বুকে, পিঠে. পেটে, কালো দাগ দেখা যায়। চামড়ার রং কালো হয়ে যায় বা ছোট ছোট কালো দাগ হয়।
- হাত ও পায়ের তালু শক্ত খসখসে হয়ে যায় ও ছোট ছোট শক্ত গুটি দেখা দিতে পারে। পরে কালো কালো দাগ হয়।
- গায়ের চামড়া মোটা ও খসখসে হয়ে যায়।
- বমি বমি ভাব এবং বমি হয়: পাতলা পায়খানা হয়।
- খাওয়া-দাওয়ায় অরুচি, রক্ত আমাশয়, মুখে ঘা ইত্যাদি দেখা দেয়।
- কখনো কখনো জিহবার উপর ও গায়ের ভিতর কালো হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষণসমূহঃ

- চামড়ার বিভিন্ন জায়গায় সাদা, কালো বা লাল দাগ দেখা দেয়।
- হাত-পায়ের তালু ফেটে যায় ও শক্ত গুটি ওঠে।
- হাত-পা ফুলে ওঠে।

তৃতীয় পর্যায়ের লক্ষণসমূহঃ

- কিডনি, লিভার ও ফুসফুস বড় হয়ে যায় ও টিউমার হয়।
- হাত ও পায়ে ঘা হয়, পচন ধরে।
- চামড়া, মূত্রখানি, ফুসফুসে ক্যান্সার হয়।
- কিডনি ও লিভার অকেজো হয়ে যায়।
- জন্ডিস হয়।
- পেটে ও মাথায় ব্যথা হয়।
- রক্ত বমি হয়।

অন্যান্য উপসর্গঃ

- শারীরিক দুর্বলতা
- দীর্ঘস্থায়ী কাশি
- চোখ লাল হয়ে যাওয়া
- অবশভাব

আর্সেনিকে আক্রান্ত হলে করনীয়ঃ

- আর্সেনিক রোগের উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তার অথবা স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে দেখা করতে হবে ও তার পরামর্শ মেনে চলতে হবে।
- অবশ্যই আর্সেনিকমুক্ত পানি পান করতে হবে।
- নদী, পুকুর, বিল ইত্যাদির পানি ছেঁকে ২০ মিনিট ফুটিয়ে পান করা যায়।
- বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি পান করা যেতে পারে, এজন্য বৃষ্টি শুরু হওয়ার ৫মিনিট পর পানি ধরতে হবে।
- আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগী সবধরনের খাবার খেতে পারেন। তবে শাক-সবজি ও পুষ্টিকর খাবার বেশি করে খেতে হবে।

আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রাঃ

আর্সেনিকের মাত্রা ০.০১ mg আর্সেনিক থাকলে তা পানের উপযোগী থাকে। তবে বাংলাদেশে প্রতি লিটারে ০.০৫ mg পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য। ।

আর্সেনিকোসিস রোগের জটিলতাঃ

- পা ফোলা
- গ্যাংগ্রিণ বা পচন
- বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার
- দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত
- প্রজনন জটিলতা যথাঃ গর্ভপাত, মৃত-সন্তান প্রসব ইত্যাদি; এছাড়া যকৃত মুত্রাশয়, ফুসফুস ও বৃক্ক আক্রান্ত হতে পারে।

আর্সেনিকোসিস রোগের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা ঃ

আর্সেনিকোসিস থেকে সম্পূর্ণ নিরাময়ের কোন চিকিৎসা পদ্ধতি এখনো আবিস্কৃত হয়নি। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় এবং আর্সেনিক দূষিত নলকূপের পানি পান বন্ধ করলে রোগীর উন্নতি অনেকাংশে সম্ভব হয়। আর্সেনিকোসিসের কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় রোগ প্রশমনের নিমিত্তে আমাদের দেশে

বর্তমানে নিম্নলিখিত চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু আছে।

- আর্সেনিক দূষিত টিউবওয়েলের পানি পান বন্ধ করা এবং রান্নার কাজে ব্যবহার না করা।
- ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ।
- বেশি পরিমাণে আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করলে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে আমিষ জাতীয় উদ্ভিজ্জ খাদ্য যেমন সীমের বীচি, কাঠালের বীচি, মটরশুটি, বরবটি, ডাল ইত্যাদি তাছাড়া বিভিন্ন রকমের শাক-সবজি যেমন- পুই শাক, সজনে শাক ইত্যাদি বেশি করে খেলে এ রোগের লক্ষন ধীরে ধীরে কমে এসে নিরাময় হতে থাকে।

আর্সেনিক দূষণ মুক্ত টিউবওয়েল

আর্সেনিক দূষণ যুক্ত টিউবওয়েল

আর্সেনিক জনিত রোগ নিরাময়ে উপকারী বাংলাদেশে সহজলভ্য কিছু খাদ্য তালিকাঃ

- **আমিষ-** মুগ ডাল, মসুর ডাল, ছোলা, খেসারীর ডাল, সয়াবিন, চীনাবাদাম, সীমবীচি, কাঁঠাল বীচি, মাছ, ইত্যাদি।
- **ভিটামিন এ-** পাকা পেপে, পাকা আম, পাকা কাঁঠাল, আনারস, মিষ্টি কুমড়া, কাঁচামরিচ, পুইডাটা, ঢেড়শ, শিম, করলা, গাজর, কচু শাক, ধনেপাতা, সাজনা পাতা, খেসারী শাক, সরিষা শাক, মিষ্টি আলু শাক, পুদিনা পাতা, লাল শাক, কলমি শাক, পুই শাক, পাট শাক, হেলেঞ্চা, ডাটা শাক, থানকুনি পাতা, মিষ্টি কুমড়া শাক, মূলা শাক, পালং শাক।
- **ভিটামিন সি-** আমলকি, পেয়ারা, জাম্বুরা, আমড়া, কামরাঙ্গা, লেবু, কাঁচা আম, পালং শাক, ডাটা শাক, পুই শাক, কালো কচু শাক, লাল শাক, সাজনা পাতা, মূলা শাক, ওলকপি, উচ্ছে, কাঁচা মরিচ, ফুলকপি, করলা।
- **ভিটামিন ই-** যুক্ত দেশীয় খাদ্য- ডাল, বাদাম, বীজ, সবুজ শাক, শস্যের অংকুর, সয়াবীন, ডিমের কুসুম।
- **সেলিনিয়াম-** মাছ, মাংস, কিডনী, সমুদ্রের খাবার, বিভিন্ন শস্য ও বাদাম।

আর্সেনিক দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য করণীয় ঃ

- নলকূপ বসানোর আগে মাটির নিচের পানিতে আর্সেনিক মাত্রা পরীক্ষা করে দেখতে হবে;
- পুরানো নলকূপের পানিতে আর্সেনিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে, টিউবওয়েল বসানোর আগে আশেপাশের টিউবওয়েলের পানি পরীক্ষা করতে হবে;
- টিউবওয়েল বসানোর পর, গোড়া বাঁধানোর আগে আর্সেনিক পরীক্ষা করাতে হবে।
- টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেলে টিউবওয়েলের মুখ লাল রং করতে হবে। পানিতে আর্সেনিক না থাকলে সবুজ রং করতে হবে। লাল রং দেখলে ঐ নলকূপের পানি খাওয়া যাবে না;
- আর্সেনিক দূষণমুক্ত টিউবওয়েলের পানি প্রতি ৬ মাস পরপর পরীক্ষা করাতে হবে। দেখতে হবে পানি আর্সেনিক দূষনমুক্ত আছে কি না।
- আর্সেনিকযুক্ত পানি রান্না ও খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- পাতকুয়ার পানিতে আর্সেনিক আছে কিনা পরীক্ষা করে পান করতে হবে।
- পুকুর বা নদীর পানি বিশুদ্ধ করে পান করতে হবে। এজন্য এক কলসি ২০ লিটার পানিতে আধা চামচ ১০ মিলিগ্রাম ফিটকিরি মিশিয়ে ২-৩ ঘন্টা রেখে দিতে হবে। ফিটকিরি মিশালে পানির ময়লা কলসির নিচে জমা হবে। সাবধানে পাত্রের উপরের পরিস্কার পানি অন্য পাত্রে ঢেলে ফুটিয়ে পান করতে হবে;
- বৃষ্টির পানি আর্সেনিকমুক্ত। তাই বৃষ্টির শুরু হওয়ার ৫ মিনিট পর পরিস্কার পাত্রে ধরে সেই পানি খাওয়া ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়।
- আর্সেনিকযুক্ত পানি ফুটিয়ে খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে কারণ ফুটালে আর্সেনিক দূর হয় না বরং পানি শুকিয়ে গেলে তাতে আর্সেনিকের ঘনত্ব আরো বেড়ে যায়।

পানির আর্সেনিক পরীক্ষাঃ

আমরা দুইভাবে পানি পরীক্ষা করতে পারি–

১। ফিল্ড কিটের মাধ্যমে।

২। গবেষণাগারে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে।

এছাড়া নিজে না করে উপজেলা বা জেলার পরীক্ষাগারে পানি নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। ফিল্ড কিটের সাহায্যে খুব অল্প সময়ে পানি পরীক্ষা করা যায়। ফিল্ড কিটে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকে। টিউবওয়েল থেকে পানি নিয়ে সাথে সাথেই পানি পরীক্ষা করা যায়।

সরকারিভাবে উপজেলা পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। বেসরকারিভাবে বিভিন্ন এনজিও, যারা আর্সেনিক নিয়ে কাজ করে তাদের সাথে যোগাযোগ করেও পরীক্ষা করানো যায়।

আর্সেনিক ছোঁয়াচে বা বংশগত রোগ নয়

পোলিও

ইপিআই কার্যক্রমের মাধ্যমে টিকা দিয়ে যে আটটি রোগ প্রতিরোধ করা যায় সেগুলো হলোঃ ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, পোলিও, হাম, যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস-বি, হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জ। এই সবকটি রোগই সংক্রামক এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান। এক বৎসরের কম বয়সের শিশুদের এগুলো অত্যন্ত মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। এই সবকটি রোগই টিকাদানের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ পর্যায়ে পোলিও রোগ নিয়ে আলোচনা করা হলোঃ

টীকাদান কর্মী ব্যাজ

পোলিও (পোলিও মাইলাইটিস) এর কারণ, রোগজীবাণুর নাম, লক্ষণ, ভয়াবহতা ও প্রতিরোধঃ

কারণ ঃ

আক্রান্ত শিশুর মল দ্বারা দূষিত পানি খেলে বা আক্রান্ত শিশুর সংস্পর্শে এলে এই রোগ হতে পারে।

জীবানুর নামঃ

পোলিও ভাইরাস (Polio Virus)

লক্ষণ ঃ

১-৩ দিন

- শিশুর সর্দি, কাশি এবং সামান্য জ্বর হয়।

১-৫ দিন

- মাথা ব্যথা করে, ঘাড় শক্ত হয়ে যায়;

ছবি : পোলিও আক্রান্ত শিশু

- জ্বর থাকে;
- শিশুর হাত অথবা পা অবশ হয়ে যায়;
- শিশু দাঁড়াতে চায় না;
- উঁচু করে ধরলে আক্রান্ত পায়ের পাতা ঝুলে পড়ে;
- দাঁড় করাতে চাইলে শিশু কান্নাকাটি করে এবং নাড়াচড়া করতে পারে না;
- শিশুর আক্রান্ত অঙ্গ ক্রমশ দূর্বল হয় এবং পরে স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে।

ভয়াবহতাঃ

শিশুর এক বা একাধিক অঙ্গ অবশ হয়ে যায়। ফলে আক্রান্ত অঙ্গ দিয়ে স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। আক্রান্ত অঙ্গের মাংসপেশী চিকন হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের পেশী অবশ হয়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে শিশু মারাও যেতে পারে।

প্রতিরোধ ঃ

এক মাস পর তিন ডোজ এবং হামের টিকা দেওয়ার সময় আরো একবার অর্থাৎ মোট চার বার পোলিও টিকা শিশুর এক বছর বয়সের ভিতরে খাওয়ানো হলে তা শিশুর দেহে পোলিও রোগ প্রতিরোধ করে। প্রথম ডোজ দেওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় শিশুর ৬ সপ্তাহ বয়স। যদি কোন শিশু ক্লিনিক বা হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করে তাহলে তাকে জন্মের পর পরই এক ডোজ পোলিও টিকা দিতে হবে। এবং শিশুর ৬ সপ্তাহ বয়সে থেকে নিয়মিত চার ডোজের সিডিউল শুরু করতে হবে।

ডেঙ্গু জ্বর

ডেঙ্গু জ্বর মৃদু হাল্কা থেকে মারাত্মক ধরণের হয়ে থাকে। মৃদু ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে তীব্র জ্বর, শরীরে লালচে দানা এবং মাংসপেশী ও হাড়ে ব্যথা হয়। মারাত্মক ডেঙ্গু জ্বরে ডেঙ্গু

হেমোরেজিক জ্বর এবং ডেঙ্গু শক সিনড্রোম মারাত্মক রক্তক্ষরণ, রক্তচাপ কমে যাওয়া এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

ডেঙ্গু জ্বর কি ঃ

ডেঙ্গু জ্বর একধরণের জীবাণু বাহিত একটি রোগ। ডেঙ্গুজ্বরের নিদির্ষ্ট কোন চিকিৎসা নেই এবং অধিকাংশ রোগীই আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু রোগের মারাত্মক ধরনে আক্রান্ত হলে রোগীকে অবশ্যই হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাতে হবে।

কিভাবে হয় ঃ

এডিস নামে এক ধরনের মশার কামড়ে ডেঙ্গুজ্বর হয়। এই মশা সাধারনত দিনের বেলা কামড়ায়।

ডেঙ্গুজ্বর হয়েছে কি করে বুঝবে ঃ

রোগের ধরণ ও মাত্রা অনুযায়ী ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণ ও উপসর্গ ভিন্ন হয়ে থাকে। ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব লক্ষণ ও উপসর্গ দেখা যায় সেগুলো হলো-

- তীব্র জ্বর- ১০৫ ফারেনহাইট ৪০.৬ সে. পর্যন্ত;
- সারা শরীরজুড়ে লালচে দানা যা কিছুদিনের জন্য চলে গিয়ে পুনরায় দেখা যায়;
- দাঁতের মাটি দিয়ে রক্ত পড়া;
- তীব্র মাথা ব্যথা, পিঠ ব্যথা অথবা দুটোই;
- চোখের পিছনে ব্যথা;
- অস্থি সন্ধি এবং মাংসপেশীতে তীব্র ব্যথা;
- বমি বমি ভাব এবং বমি;
- পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়া অথবা কালো কংবা লালচে-কালো রঙের পায়খানা, এমনকি প্রস্রাবের সঙ্গেও অনেক সময় রক্ত যেতে পারে।

ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর ঃ

এটি রোগের মারাত্মক একটি ধরণ। এই জ্বরে মৃদু ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণ ও উপসর্গের পাশাপাশি অন্যান্য যে সমস্যা গুলো হয়-

- রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্যকারী রক্ত কোষের সংখ্যা কমে যায়;
- চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ হয় এবং নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত পড়া শুরু হয়;
- অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঃ

- তীব্র পেটে ব্যথা
- ঘন ঘন বমি
- জ্ঞান হারানো
- অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ
- রক্তচাপ হঠাৎ কমে যাওয়া
- এতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে

রোগী কেন মারা যায়ঃ

অত্যধিক তাপমাত্রার জ্বরের জন্য দেহে দ্রুত পানিশূন্যতা দেখা দেয়। কোষের অভ্যন্তরীণ তরল কমে যায়, আশপাশের রক্তনালিতে চাপ পড়ে, শুরু হয় রক্তক্ষরণ। ইন্টারনাল ব্লিডিং। বেশি মাত্রায় রক্তক্ষরণ চলতে থাকলে অনুচক্রিকা বা প্লেটলেট সংখ্যায় কমে যায়। প্লেটলেট কমে গেলে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না, ফলে ধীরে ধীরে রক্তক্ষরণ আরও বাড়তে থাকে। দেখা যায় শক সিনড্রম। শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। যথাযথ চিকিৎসা- ব্যবস্থাপনার অভাবে রোগীর দ্রুত অবনতি ঘটে। নেমে আসে অবাঞ্ছিত মৃত্যুর অন্ধকার।

কি চিকিৎসা আছেঃ

- বেশি করে তরল জাতীয় খাদ্য গ্রহণ
- প্যারাসিটামল ঔষধ সেবন
- হাসপাতালে রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা
- দরকার হলে শিরাপথে স্যালাইন দেয়া
- রক্তচাপ পরীক্ষা
- রক্ত ঘাটতি পূরণের জন্য রক্ত দেয়া।

পথ্য ও বাড়তি সতর্কতাঃ

- বমি এবং জ্বর থেকে পানিশূন্যতা পূরণের জন্য রোগীকে বেশি করে স্যালাইন ও অন্যান্য তরল খাবার খেতে দিতে হবে।
- আক্রান্ত রোগীকে মশারীর ভিতর রাখতে হবে।
- কখনোই নিজে থেকে কোন ব্যথানাশক ঔষধ খাবেন না তাতে ডেঙ্গুজ্বরের জটিলতা বেড়ে যেতে পারে।

ডেঙ্গুজ্বর কিভাবে প্রতিরোধ করবেনঃ

- ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণু বহনকারী মশা দিনের বেলায় কামড়ায়। তাই দিনের বেলা মশারী টাঙিয়ে অথবা কয়েল জ্বালিয়ে ঘুমাতে হয়।
- ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই সবসময় মশারীর মধ্যে রাখতে হবে যাতে করে রোগীকে কোন মশা কামড়াতে না পারে।
- বাড়ির আশেপাশের ঝোপঝাড় জঙ্গল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- বাড়ির আশেপাশের ভাঙ্গা ফুলের টব, ভাঙ্গা ফুলদানি, অব্যবহৃত কৌটা, ডাবের খোসা, ভাঙ্গা বেসিন, অব্যবহৃত টায়ার, মুখ খোলা পানির ট্যাঙ্ক, প্লাষ্টিকের প্যাকেট, পলিথিন এবং ঘরের আশেপাশে যেন পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ তিন-ভি ঃ

ডেঙ্গু হবে না, যদি পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকি, দৈনন্দিন স্বাস্থ্য-অভ্যাস পরিবর্তন করি। ভেক্টর এডিস মশা, ভিকটিম রোগী, ভাইরাস ডেঙ্গু ভাইরাস এই তিনটি ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এডিস মশা ডেঙ্গুর ভেক্টর বা বাহক। কাজেই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নিজের ঘর, আঙিনায় মশার উৎস ধ্বংস কর। ফুলের টব, পুরানো ক্যান বা পাত্র, গামলা, গাছের কোটরে যাতে চার পাঁচ দিন পানি জমে না থাকে, ছোট্ট আবদ্ধ জায়গায় যাতে বৃষ্টির পানি জমে না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখ। নিজেই উদ্যোগী হও, কারও আশায় থেকো না। মিউসিপ্যালিটির জন্য অপেক্ষা না করে নিজ উদ্যেগে আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখ। ভিকটিম, অর্থাৎ রোগীর যথাযথ চিকিৎসা করাও। কোথাও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পেলে আশপাশের সবাইকে তা জানাও এবং এলাকার ঘরবাড়িতে বিশেষ মশকনিধন অভিযান পরিচালনা কর।

(খ) স্কাউট কার্যাবলীতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণ

সমাজ সেবা ঃ

এতদিন তুমি ছোট খাট কাজের মাধ্যমে সমাজ সেবা করেছ এবং অনেক কিছু শিখেছ। এখন তোমার কাজের এলাকা বাড়াতে হবে। আরো বড় ধরনের কাজ করতে হবে। তোমার পরিকল্পনাও তেমনি বড় ও সুদুর প্রসারী হবে। শুধু নিজের বিদ্যালয় বা মহল্লা নিয়ে ভাবলে চলবে না। আরো বড় এলাকা নিয়ে ভাবতে হবে।

সমাজের প্রয়োজন সমূহের দিকে দৃষ্টি রেখে তোমাকে ঠিক করতে হবে তোমার কোন কাজটি আগে করা দরকার। আসলে সমাজের জন্য কাজ করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। তোমাকে দেখতে হবে কোথায় কোন কাজটি কিভাবে করলে সবার বেশী উপকার হবে। তাই সব বিষয়ের আগে চিন্তা ভাবনা করে সবদিকে লক্ষ্য রেখে

পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে লেখাপড়া শিখানো, টিকা-ইনজেকশন দেয়ার সহায়তা করা, পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশগ্রহন, লোকজনকে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিক্ষা দেয়া, হাঁস-মুরগী পালন, গাছ লাগানো, চক্ষু শিবির ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীতে সহায়তা দান ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের সেবা করা যায়।

এ ব্যাপারে তোমার স্কাউট নেতার সাথে পরামর্শ করতে পার। তিনি তোমাকে সঠিক প্রকল্প নির্বাচনে সহায়তা করতে পারবেন। যথেষ্ট ধৈর্য্য ও দক্ষতার সাথে তোমাকে সমাজ সেবার কাজ করতে হবে। কাজ শেষ হলে সুন্দর করে এবং বিস্তারিত ভাবে রিপোর্ট তৈরী করবে যা তোমার প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড এর "লগ বুক" এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে লগ বুক এখন তৈরী করা বাধ্যতামূলক নয়।

(২) বিভিন্ন মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ ও সচেতনতা ঃ

ক) মাদকাসক্তি বা Drug Addiction ঃ

বির্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী সমস্যার নাম মাদকাসক্তি বা Drug Addiction। এমন দেশটি সম্ভবত বিশ্বের কোথাও পাওয়া যাবে না, যেখানে মাদকাসক্তির কালো ছায়া তাদের তরুন সমাজকে স্পর্শ করেনি। মাদকাসক্তি আমাদের সমাজে এক সর্বনাশা ব্যাধিরুপে বিস্তার লাভ করছে। দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে এদেশের বিভিন্ন শহরে শহরতলিতে গ্রামে গ্রামান্তরে। এর ভয়াবহ পরিনতি দেখে আজ প্রশাসন বিচলিত, অভিভাবকেরা আতঙ্কিত।

কোন নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন বা গ্রহন করে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়াই মাদকাসক্তি। মাদকদ্রব্য মানবদেহের মস্তিষ্কজাত সংজ্ঞাবহ সংবেদন হ্রাস করে, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, মানসিক আচ্ছন্নতাসহ রক্তচাপ হ্রাস করে। মাদকদ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো আফিম। এ আফিম থেকেই বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী হয় সর্বনাশা হেরোইন। গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল (লাওস, মায়নমার, থাইল্যান্ড), গোল্ডেন ক্রিসেন্ট (আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরান) এবং গোল্ডেন ওয়েজ হেরোইনের মূল উৎস। এছাড়া মদ, গাঁজা, মরফিম, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল, কোকেন ইত্যাদি মাদকদ্রব্য হিসেবে বহুল প্রচলিত। আর বর্তমানে আরেক ত্রাস হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে ইয়াবা।

মাদকাসক্তির কারণঃ

নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সঙ্গদোষ, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের অস্থিরতা, কৌতুহল ও সৌখিনতা ইত্যাদিকে মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা

করা যায়। মাদকদ্রব্যের উপর আসক্তি একদিন বা হঠাৎ করেই জন্মায় না। দিনে দিনে এর প্রতি আসক্তি গড়ে ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ধূমপান থেকেই মাদকাসক্তির শুরু। মাদকাসক্তির বহুবিধ কারণের মধ্যে-

- পারিবারিক কলহ, নৈরাশ্য ও অশান্তি
- অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও বেকারত্বজনিত হতাশা
- কৌতূহল নিবারণ ও সৌখিনতা
- মাদকাসক্ত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ ও প্ররোচনা
- প্রনয়ঘটিত ব্যর্থতা; ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মাদকাসক্তির প্রভাবঃ

মাদকাসক্তির প্রভাবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অধঃপতন পরিলক্ষিত হয়। সমাজে অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি পায়। মাদকাশক্তির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মাদকাসক্ত ব্যক্তি যেমন নিরাপদ নয় তেমনি নিরাপদ নয় তার পরিবার ও সমাজ। মাদক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর মধ্যে;

- কাজের ক্ষমতা কমে যেতে পারে
- যক্ষ্মা, ফুসফুসে ক্যান্সার সহ লিভার নষ্ট হতে পারে
- স্মৃতিশক্তি লোপ পায়
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়
- রক্ত স্বল্পতা দেখা দিতে পারে
- মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, সবসময় চরম অবসাদে ভোগে
- উচ্ছৃঙ্খল ও অস্বাভাবিক আচরণ করে
- পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হয়
- সমাজে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বৃদ্ধি পায়

প্রতিকারঃ

বর্তমানে পৃথিবীর কোন দেশই এর মরণ ছোবল থেকে মুক্ত নয়। এর ফলে প্রতিটি দেশ সমাজ ক্রমেই ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। এ ধ্বংস থেকে সমাজ বিশেষত যুব সমাজকে রক্ষা করা আমাদের সকলের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। একজন মাদকসেবী আমাদেরই পরিবারের কেউ না কেউ। তাই এ সমস্যা নির্মূলে পরিবার তথা সমাজের-ই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে।

- পিতা মাতার সার্বক্ষনিক তার সন্তানের প্রতি নজর রাখা উচিত, যেন তার সন্তানটি মাদকসেবীদের একজন না হয়।

- সন্তানদের সাথে মাদকাসক্তি তথা এরূপ সামাজিক ব্যাধির কুফল নিয়ে মাঝে মাঝেই ঘরোয়া পরিবেশে আলোচনা করা।
- সন্তানদের সাথে না পারত ভাল ব্যবহার তথা বকাঝকা করা উচিত নয়। তাদের ভুলগুলো যত্নের সাথে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। কেননা মাতা-পিতার এ ধরনের ভুল পদক্ষেপ তার সন্তানকে ভুল পথে যেতে প্ররোচনা যোগায়।
- সন্তান যেন খারাপ সঙ্গে না জড়ায় সে দিকে নজর রাখা উচিত।
- সুন্দর, আনন্দময় ও প্রীতিপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলা।
- মাদক নিবারণের জন্য সমাজ ও স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তি বর্গের সমন্বয়ে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। মাদক গ্রহণ করাকে ঘৃণার চোখে দেখা উচিত। সমাজপতিগণ নিজেরা মাদকমুক্ত থেকে এবং তাদের প্রভাব খাটিয়ে মাদক প্রতিরোধ করতে পারেন।
- সমাজের মাদকব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়াতে হবে সমাজে বসবাসকারীদেরই। কেননা না এদের মাধ্যমেই যে কারো সন্তান পা বাড়াতে পারে এ ভয়াল পথে।
- স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মাদকাসক্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
- প্রতিটি ধর্মেই মাদকসেবন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সন্তানরা যেন ধর্মের প্রতি অনুগত্ব থাকে, সে শিক্ষা পিতা-মাতারই দিতে হবে।

(৩) প্রতিমাসে কমপক্ষে ২০ টাকা সঞ্চয় / উপার্জন করতে পারাঃ

প্রত্যেকটি তরুণ-তরুণী চায় স্বাবলম্বী হতে। এতে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। নিজের শখের জিনিসগুলো যদি নিজের রোজগার করা টাকায় জোগাড় করা যায় তবে তার চেয়ে খুশীর ব্যাপার আর কি? তাই প্রতিটি স্কাউটের উচিত অর্থ উপার্জন করা। কিন্তু টাকা রোজগার করাটা খুব একটা সহজ কাজ নয়। যেমন একটা ছেলে তার মায়ের কাছে কিছু পয়সা চাইল। আর মা তাকে পয়সা দিয়ে দিলেন। ছেলে কিছু পয়সা পেল। কিন্তু ঐ পয়সাগুলো ছেলে সঠিক অর্থে রোজগার করেনি। এটা ছেলের জন্য মায়ের দান মাত্র। এতে বোঝা যায়, চেয়ে নেওয়া টাকা মোটেই রোজগার নয়।

লক্ষ্য রাখতে হবে যে, স্কাউটেরা যেন টাকা রোজগার করে। কাজ করে টাকা পয়সা জোগাড় করবে। খুব সহজেই পরিশ্রমের বদলে টাকা রোজগার করা যেতে পারে। যদি তুমি গ্রামের স্কাউট হও, তবে কারো জমিতে শ্রমের কাজ করে দিলে তিনি তোমাকে মজুরি দেবেন তা তোমার রোজগার করা হবে। তাছাড়াও নিজ বাসায় হাঁস, মুরগি, কবুতর পুষে এবং তা বিক্রি করে রোজগার করা যায়। বর্ষাকালে পাটখড়ি (যা লোকে ফেলে দিয়েছে) জোগাড় করে শুকিয়ে বাজারে বিক্রি করলে টাকা পাবে। যদি শহরের স্কাউট হও তোমরা বাসার পুরনো অপ্রয়োজনীয় জিনিস, যেমন জুতা, সেন্ডেল, কাপড়, খাতাপত্র জমিয়ে রাখ। পরে বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে ফেরিওয়ালার কাছে বিক্রি করলে যে টাকা হবে তা তোমার রোজগার করা আয়। তবে শহরেও আজকাল প্রাণী পুষে তা থেকে আয় করা যায়।

তোমার স্কুলে ব্যবহৃত রাফ খাতা লেখা শেষ হয়ে গেলে তা ওজন দরে বিক্রি না করে ওই কাগজ দিয়ে যদি তুমি ঠোঙা বানিয়ে বিক্রি কর তাহলে কাগজ বেচার চেয়ে বেশি দাম হবে। বাড়িতে রাখা খবরের কাগজ দিয়েও ঠোঙা বানিয়ে তা বিক্রি করে তুমি কিছু আয় করতে পার।

এভাবে কমপক্ষে বিশ টাকা আয় কর। একাজে তোমার অভিভাবকদের পরামর্শ নেবে। তুমি কিভাবে টাকা রোজগার করলে তার বিবরণ তোমার স্কাউট লিডারকে জানাও। নিজের শ্রম দিয়ে টাকা রোজগার করলে সুখ পাওয়া যায়। তার চেয়েও বেশি সুখ পাওয়া যায় সে টাকা ভাল কাজে খরচ করে।

❒ স্বদেশ সংস্কৃতি ও পরিবেশ ঃ

(১) পরিবেশ

রিং ও একটি স্ল্যাবের সাহায্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরী ঃ

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ

- একটি রিং
- একটি স্ল্যাব
- নিচু কমোড যুক্ত স্লাব

তৈরী পদ্ধতি ঃ

১. যে স্থানে ল্যাট্রিন স্থাপন করা হবে তা বসতবাড়ির উত্তর দিকে হওয়া উচিত।

২. ল্যাট্রিন সমতল থেকে উঁচু শক্ত মাটিতে তৈরী করতে হবে।

৩. ল্যাট্রিন কুয়া, পুকুর ইত্যাদি থেকে প্রায় ২১ হাত দূরে তৈরী করতে হবে।

৪. ল্যাট্রিন বসাবার জন্য গর্তটি রিং-এর চাইতে সামান্য বড় করতে হবে।

৫. গর্তের গভীরতা কমপক্ষে ৪ হাত হবে।

৬. গর্তের ভিতর রিং বসাতে হবে।

৭. এরপর রিং-এর উপর স্ল্যাব বসাতে হবে।

৮. মাটি নরম হলে পাড় ভেঙে যেতে পারে। সেজন্য গর্তের ভিতর বাঁশের খাঁচা বসানো যেতে পারে।

(২) বাংলাদেশ সরকারের গঠন ও কার্যাবলী

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব জনগনের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা। বিদেশী আক্রমনের মোকাবেলার জন্য সর্বদা তৈরী থাকা। দেশের চাহিদা মিটানো এবং জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, সেই সাথে অন্যান্য দেশের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা। ইতোপূর্বে প্রোগ্রেস ব্যাজ স্তরে তোমরা জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কাজ সম্পর্কে শিখেছ। এই স্তরে সরকারের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে শিখবে।

সরকারকে যে সমস্ত কাজ করতে হয়, তা হচ্ছে আইন কানুন তৈরী, শাসন পরিচালনা করা এবং বিচারকার্য সম্পাদন করা। এই সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনার্থে বাংলাদেশ সরকার তিনটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। বিভাগ তিনটি নিম্নরুপঃ

শাসন বিভাগঃ কোন রাষ্ট্রের সরকারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ, যারা দেশের আইনসভা কর্তৃক পাসকৃত সকল প্রকার আইন কার্যকর করতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা করেন, সাধারণ অর্থে তাদের নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত। এক কথায় প্রশাসনের নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারনে নিয়োজিত সকাল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই বিভাগের অন্তর্ভূক্ত। রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীপরিষদ ও কর্মচারীগন দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করেন। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহ প্রয়োগ করে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করা, অভ্যন্তরীন শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সেই অনুযায়ী জনসাধারণকে পরিচালিত হতে বাধ্য করা এই বিভাগের প্রধান কাজ। এছাড়া সামরিক বাহিনী গঠন, নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, উন্নয়ন, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি শাসন বিভাগের কাজ।

আইন বিভাগ (Legislative) ঃ আইন বিভাগ বা আইন পরিষদ হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র। বাংলাদেশের আইন পরিষদের নাম জাতীয় সংসদ। জনগনের ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা হচ্ছে- ৩৪৫ (৩০০+৪৫) জন। এর মধ্যে মহিলাদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষিত যা সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হয়। দেশের জন্য আইন তৈরী, পরিবর্তন, বাতিল ইত্যাদি জাতীয় সংসদের প্রধান কাজ।

জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ট সংসদ সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। শাসন বিভাগ পরিচালনা, জাতীয় তহবিলের হেফাজত, দেশের বাজেট তৈরী ও পাশ করা তাদের কাজ। জাতীয় সংসদ দেশের প্রেসিডেন্টও নির্বাচন করে। এর মেয়াদ পাঁচ বছর।

বিচার বিভাগ (Judiciary) ঃ দেশের বিভিন্ন আদালতের বিচারকদের নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত। আইন পরিষদ যে আইন তৈরী করে, বিচার বিভাগ সেই আইন অনুসারে বিচার কার্য সম্পাদন করে। সারা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নাম সুপ্রীম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির অধীনে কয়েকজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত এই আদালত। সুপ্রীম কোর্টের অধীনে আছে হাইকোর্ট ডিভিশন এর অধীনে প্রতি জেলায় আছে একটি করে জজ কোর্ট। তাদের অধীনে আছে অতিরিক্ত জজ, যুগ্ম জজ ও সহকারী জজ কোর্ট। এছাড়া ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য রয়েছে ম্যাজিষ্ট্রেট। সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্ট এর প্রধান বিচারপতি ও বিচারকগণ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হন।

দোষী ব্যক্তিকে সাজা দান এবং সত্য প্রতিষ্ঠা ও বিচার পরিচালনা করা বিচার বিভাগের মূল লক্ষ্য। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, আইনের ব্যাখ্যা দান, শাসনতন্ত্রে বর্ণিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা ইত্যাদি বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ন কাজ। এছাড়া সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী/অপসারণ সম্পর্কে জটিলতা, দন্ডদান, শ্রমিক শ্রেণীর অভিযোগ নিষ্পত্তিও এই বিভাগের কাজ।

(৩) শব্দ দূষণ

ক) শব্দ ঃ শব্দ এক প্রকার শক্তি যা কোন বস্তুর কম্পনের ফলে উৎপন্ন হয়। শব্দ প্রবাহের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয় যেমন ঃ বাতাস ও পানি। প্রাত্যাহিক জীবনে শব্দ অতি প্রয়োজনীয় (যেমন ঃ কথা বলা, কোন কিছু শোনা) তবে নয়জ (Noice) নয়। নয়জ হচ্ছে সাধারণত অপ্রয়োজনীয় শব্দ বা বিরক্তিকর শব্দ যা আমাদের কানে অস্বস্থিকর। শব্দ বা অপ্রয়োজনীয় শব্দ পরিমাপ করা হয় ডেসিবেল (dB) দ্বারা।

শব্দ দূষণ ঃ শব্দ অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় যখন এটা স্বাভাবিক কাজকর্মকে বিঘ্নিত করে। যেমন ঃ ঘুম, কথোপকথোন, অথবা জীবনের স্বাচ্ছন্দ কমায় বা ছিন্ন করে। একেই শব্দ দূষণ বলে। অতএব শব্দ দূষণ হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় শব্দ। যার দ্বারা পরিবেশ দূষণ হয়। যদিও শব্দ দূষণ মনে করা হয় পানি দূষণ, বায়ু দূষণ ও ভূমি দূষণ হতে কম ক্ষতিকর। কিন্তু যারা শব্দ দূষণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ শুধু তারাই বুঝে এটা কত ক্ষতিকর। তাই আমাদের শব্দ দূষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

শব্দ দূষণের কারণ ঃ সাধারণত অপ্রয়োজনীয় শব্দ তৈরি হয় ঘরের আসবাবপত্র, গাড়ী, মটর সাইকেল, উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টর এবং লাউড স্পীকার ইত্যাদি দ্বারা।

খ) শব্দ দূষণের প্রতিকার সম্পর্কে জানা ঃ নিম্নোক্ত কিছু উপায়ে জনসাধারণ এবং সরকার অপ্রয়োজনীয় শব্দ দূষণ কমিয়ে আমাদের পরিবেশকে শান্ত রাখতে পারে। যেমন ঃ

* কলকারখানাগুলোকে শব্দরোধক ভাবে তৈরি করা। যাতে তার ভিতরের শব্দযুক্ত যন্ত্রপাতির অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাহিরে না আসে সে ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা।

* বাসস্থানের অপ্রয়োজনীয় শব্দযুক্ত যন্ত্রপাতি ঘুমানোর ঘর এবং থাকার ঘর থেকে দূরে যেমন গ্যারেজ বা বেইজমেন্টে স্থাপন কর।

* শ্রুতিকটু হর্ণ, হাউড্রোলিক হর্ণ এবং ক্ষতিগ্রস্থ ইগজস্ট পাইপ মটরসাইকেল গাড়ী বাস, ট্রাক ইত্যাদিতে নিষিদ্ধকরণ।

* অপ্রয়োজনীয় শব্দযুক্ত কলকারখানা, বিমানবন্দর, বাসটার্মিনাল এবং রেলস্টেশন বসবাসের স্থান থেকে দূরে স্থাপন করা।

* বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লাউড স্পীকার ও মাইকের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বন্ধ করা।

* সামাজিক আইন করে স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল ইত্যাদি এলাকা নিরব/শান্ত এলাকা ঘোষণা করা।

* রাস্তার ধারে এবং আবাসিক এলাকায় গাছ লাগিয়ে শব্দ দূষন রোধ করা। যেহেতু গাছ শব্দ শোষণ করে।

❒ প্রযুক্তি শেখা ঃ

(১) ধুঁয়া বিহীন সাশ্রয়ী চুলা

ষ্টিল ফ্রেমের অথবা মাটির তৈরী এধরনের চুলার নীচের অংশের তলা থেকে ৪/৬ ইঞ্চি উপরে লোহানেট বসান থাকে। একটি মুখ থাকে তা দিয়ে জ্বালানী সরবরাহ করা হয়। সরবরাহকৃত জ্বালানী কাঠ পুড়ে ছাই হলে তা নেটের ফাঁক দিয়ে নীচে পড়ে যায়। একটি পাইপের সাহায্যে ধুয়া বের করে নেয়া হয়। এ চুলা ব্যবহার করলে পাতিলের নীচে অপেক্ষাকৃত অনেক কম কালি জমে। তাছাড়া তাপ বেশী হওয়ার কারণে জ্বালানী অনেক কম লাগে।

কম্পিউটার

(২) কম্পিউটারের সাধারণ বাহ্যিক হার্ডওয়ার ঃ

কম্পিউটারের সাধারণ বাহ্যিক হার্ডওয়্যার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও তাদের কাজগুলো বলতে পারা

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কি?

কম্পিউটার সিসন্টেমের বাস্তবিক/ Physical components কে হার্ডওয়্যার বলে। অনেকরকম হার্ডওয়্যার আছে যা কম্পিউটারের ভিতরে অথবা বাহিরে থাকে। কম্পিউটার বাহ্যিক হার্ডওয়্যার গুলি নিম্নরূপ

* সিপিউ (CPU)

* মনিটর (Monitor)

* কি বোর্ড (Keyboard)

* মাউস Moose

* ইউপিএস (Ups/Battery Backup)

* প্রিন্টার (Printer)

* স্পীকার (Speaker)

* স্ক্যানার (Scanner)

সিপিউ ঃ সিপিউ এর অর্থ সেন্ট্রাল প্রসেসর ইউনিট। এটি একটি বাক্সের মত। যার ভেতরে একটি পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট, মাদারবোর্ড, প্রসেসর ইউনিট, র‍্যাম, ডিভিডি রম, এয়ার কুলার ইত্যাদি থাকে। এটি হচ্ছে কম্পিউটারের মূল ইউনিট।

মনিটর ঃ এটাকে ভিজুয়াল ডিসপ্লে ইউনিটও বলা হয়। এটা একটি আউটপুট ডিভাইস। এটাকে একটি টেলিভিশনের মত দেখায়। এটার স্ক্রীনে তথ্য উপস্থাপন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটা সাধারণত দুই প্রকার ঃ যথা-

(১) কালার্ড ও (২) সাদাকালো

কী বোর্ড ঃ এটা একটি বাহ্যিক হার্ডওয়ার যা দেখতে টাইপ মেশিনের মত দেখায়। যার ভেতরে অনেক ফাংশন আছে। আজকালকার কিবোর্ড এ ১১০টি কী বা তার বেশি কী থাকে। সাধারণত ১০৪ কী এর কীবোর্ড ব্যবহার হয়। যখনি আমরা একটি কী তে চাপ দেই তখনই কী বোর্ডের একটা অক্ষর মনিটরের স্কীনে দেখা যায়।

মাউস ঃ এটি একটি বাহ্যিক হার্ডওয়ার যার দ্বার ইনপুট দেয়া যায়। এটাকে পয়েন্টিং ডিভাইসও বলা হয়। যার দ্বারা ডাটা এন্ট্রি দেয়া হয়। এটা সমতল জায়গায় ব্যবহার করতে হয়। যেমন- সমতল টেবিল। এটা তারের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে লাগানো থাকে। এটা তীর চিহ্নের মত স্কীনে দেখা যায়। এটাকে মাউস পয়েন্টারও বলা হয়।

মাউস নাড়ালেই মাউস পয়েন্টার নাড়াচাড়া করে। এটাতে দুই বা তিনটি বাটন থাকে। যার দ্বার মেনু, বাটনস, ডায়ালগ বক্স এবং অন্যান্য অবজেক্টকে এক্টিভ করা বা কমান্ড দেয়া যায়। এর বাটনগুলিকে একবার চাপ প্রয়োগ করলে সিঙ্গেল ক্লিক বা তাড়াতাড়ি পরপর দুইবার চাপ প্রয়োগ করলে ডাবল ক্লিক বলে। ডানদিকের বাটনে চাপ দেয়াকে রাইট ক্লিক বলে।

ইউপিএস/ব্যাটারি বেকআপ ঃ ইউপিএস অর্থ আন ইন্টারাপ্টেড পাওয়ার সাপ্লাই অথবা ব্যাটারি বেকআপ বলা হয়। সাধারণত ব্যবহার হয় বেকআপ পাওয়ার হিসেবে জরুরী ডেস্কটপ কম্পিউটার হার্ডওয়ার কমপোনেন্ট। এটা পাওয়ার দেয় মেইন কম্পিউটার হাউজিং বা সিপিউকে এবং মনিটরকে।

প্রিন্টারঃ এই বাহ্যিক হার্ডওয়্যার এর মাধ্যমে কম্পিউটারের কোন ছবি বা লেখাকে কাগজে ছাপা বা মুদ্রণ করা যায়। প্রিন্ট করে হার্ডকপি তৈরি করা যায়। প্রিন্টার তিন প্রকার (১) ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার (২) ইঙ্কজেন্ট প্রিন্টার ও (৩) লেজার প্রিন্টার।

স্পিকারঃ এটি একটি বাহ্যিক হার্ডওয়্যার যার মাধ্যমে শব্দ শোনা যায় যেটা কম্পিউটারের শব্দ বা গান অথবা রের্কড করা কিছু হতে পারে। এটা টিভি বা টেপ রেকর্ডারের স্পিকারের মতই হয়।

স্ক্যানার ঃ এটি একটি বাহ্যিক হার্ডওয়ার যার মাধ্যমে কম্পিউটারে ইনপুট দেয়া যায়। কোন হার্ড ডকুমেন্ট যেমন ঃ যেকোন লেখা বা ছবিকে কম্পিউটারে ডুকিয়ে মনিটরে দেখা যায় এবং ব্যবহার করা যায়।

❑ গান জানা

তোমরা বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক প্রকাশিত গানের বই ও এ্যালবাম থেকে স্কাউট সর্ম্পকিত গানসমূহ শিখবে এবং চর্চা করবে।

পারদর্শিতা ব্যাজ

সার্ভিস ব্যাজ অর্জন করার জন্য তোমাদেরকে পূর্ব অর্জিত ৮টি বা তার বেশি পারদর্শিতা ব্যাজ ব্যতিত নতুন আরো ৪টি পারদর্শিতা ব্যাজ পূর্বের নিয়মানুযায়ী অর্জন করতে হবে। তবে এবার তোমাদের যে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে তা হল, সার্ভিস ব্যাজ অর্জনের জন্য তোমাদের অর্জিত ১২টি ব্যাজের মধ্যে চেতনা গ্রুপ হতে নূন্যতম ৩টি এবং অন্যান্য গ্রুপ হতে নূন্যতম ৩টি করে ব্যাজ নির্বাচন করতে পারবে।

❑ ট্রুপ মিটিং এ অংশগ্রহণ

তোমরা নিয়মিত ট্রুপ মিটিং এ অংশগ্রহণ করে স্কাউটিং কার্যক্রমকে সর্বদা গতিশীল রাখবে। এই স্তরে তোমাদেরকে কমপক্ষে ১২-১৫টি ট্রুপ মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ স্কাউটস

জাতীয় সদর দফতর

৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৩৩৩৬৫১, ৯৩৩৭৭১৪ এক্স-৩০, ফ্যাক্স : ০২ ৯৩৪২২২৬
e-mail : scouts@bangla.net
Web: scouts.gov.bd